মহানবীর আদর্শ জীবন
আবদুল হামীদ ফাইযী

মহানবী ﷺ-এর আদর্শ জীবন

ভূমিকা

মহানবী ﷺ-এর যে সুবিশাল ব্যক্তিত্ব, সুবিশাল বহুমুখী জীবন, অনুপম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চরিত্র, তাঁর জীবনের যে ইহলৌকিক, পারলৌকিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দিক, তার সবটা আয়ত্ব করা সকলের জন্য সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন মনোরম শিশু, শান্ত-শিষ্ট ও স্বভাব-সুন্দর কিশোর, আদর্শ মেষরক্ষক, চরিত্রবান ও আদর্শবান যুবক, শিষ্ট-সুশীল, অত্যন্ত লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল, অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন, অমায়িক মধুর সদালাপী, মিতভাষী, বিনম্র, বিনয়ী, ন্যায় ও সত্যের কাছে নম্র এবং অন্যায় ও বাতিলের কাছে কঠোর, সৎ ও মহৎ মানুষ, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আমানতদার, আদর্শ স্বামী, আদর্শ সংসারী, আদর্শ শ্বশুর, আদর্শ ভাই, আদর্শপরায়ণ সুপুত্র, উত্তম পিতা, আদর্শ মুবাল্লিগ বা সুকৌশলী ধর্মপ্রচারক, দুনিয়ার সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য হিদায়াতের জ্বলন্ত ভাস্কর, বিজয়ী সিপাহ্সালার, বীর যোদ্ধা, নির্ভিকচিত্ত, অসীম সাহসী, 'আবেদ' ও তাপসপ্রবর, যিক্‌রকারী, শুক্‌রকারী, কৃতজ্ঞ, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও সফল রাজনীতিবিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, গরীব-দরদী, দুঃখীর সাথী, সংবেদনশীল, দয়ার্দ্রচিত্ত, পরোপকারী, অতুলনীয় দানশীল, উদার, মহানুভব ও প্রশস্ত-হৃদয়, ন্যায়-নিষ্ঠাবান সম্রাট, নিরপেক্ষ বিচারপতি, বিষয়-বিরাগী, তুলনাহীন আদর্শ ব্যবসায়ী, নজীরহীন শিক্ষাগুরু, সদালাপী, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে রসিকতা-প্রিয়, যুগ-সংস্কারক, ভেষজবিদ ও সুচিকিৎসক, মহামানব, বিশ্বনবী, মহানবী, জগদ্‌গুরু, বিশ্বজন-নেতা, দুই জাহানের সর্দার, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, সকল সৃষ্টির সেরা।

তিনি আরো বহু কিছু। তবুও এত কিছুর মধ্য হতে যদি তাঁর ভক্তগণ তাঁর জীবনে মোটামুটি কয়েকটা দিক স্মরণে রাখতে পারেন, তাহলে নিশ্চয় তাতে

আছে প্রভূত কল্যাণ।

এই মানসেই আল-মাজমাআহর দাওয়াত অফিসের সাপ্তাহিক দর্সের কোর্সে ‘দারুল অত্বান’ (রিয়ায) কর্তৃক পরিবেশিত পুস্তিকা ‘নবী-জীবনী’কে শামিল করা হয়। নবীজীর ভক্তরা আসেন সেই দর্স নিতে, শুনতে ও আমল করে তাঁর মত জীবন গড়ার প্রয়াস চালাতে। এই পুস্তিকা আসলে তাঁদের জন্যই ক্ষুদ্র একটি উপহার। তবুও অন্যান্য ভক্তদের ভক্তির পিপাসা মিটাবার জন্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী মন্থন করে সেই সুবিশাল জীবনের মহাসমুদ্র থেকে এক কলসী পানি তুলে পেশ করলাম। আশা করি, যাঁরা মোটা বই কিনে পড়ার ক্ষমতা রাখেন না, সেই গরীব নবীভক্তদের এই পুস্তিকা বড় উপকার দেবে - ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে খাঁটি নবীভক্ত হওয়ার, তাঁর আদর্শ জীবনের অনুকরণে আদর্শ জীবন গড়ার এবং তাঁর মহব্বতের অসীলায় জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হওয়ার তওফীক দান করেন। আমীন।

বিনীত-

আবূ সালমান আব্দুল হামীদ আল-মাদানী

১লা রবীউল আওয়াল ১৪২৪হিজরী, ২রা মে ২০০৩

الحمـد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى خـاتم الأنبيـاء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

মহানবীর আদর্শ জীবনকে জানা ও তা নিয়ে পর্যালোচনা করা প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য জরুরী, যে ইসলামকে তার নিজের জীবনের জন্য সংবিধান ও রাজপথ হিসাবে বরণ করে এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-কে নিজের আদর্শ ও ইমাম, দিক্‌দিশারী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে।

নবী-জীবনী অধ্যয়ন করে মুসলিম মহানবী ﷺ-এর ইবাদত, লেন-দেন, ব্যবহার, চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে। জানতে পারে শান্তি ও যুদ্ধকালে বিরোধীদের সাথে তাঁর আচরণ-প্রণালী।

মুস্তাফা-চরিত আলোচনা করে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের দুর্বলতা ও ত্রুটির প্রধান কারণ ও উৎস আবিষ্কার করতে সক্ষম হতে পারি এবং কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে তা দূর ও সংশোধন করতে প্রয়াস পাই। তদনুরূপ আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﷺ যেমন দুর্বলতা ও লাঞ্ছনা থেকে সবলতা ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন, তেমনি আমরাও তাঁদেরই মত হতে পারঙ্গম হতে পারি।

সীরাত ও নবী-জীবনীর উপর লিখিত বই-পুস্তক অনেক আছে; যার মধ্যে কিছু আছে বিস্তারিত এবং কিছু সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে এই পুস্তিকাটিতে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে নবী জীবনীর প্রধান ও প্রসিদ্ধ দিকগুলোর শিরনাম তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। এত দ্বারা প্রত্যক মুসলিম নর-নারীকে মহানবী ﷺ-এর আদর্শ জীবনের সার-সংক্ষেপ ও তার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী ও ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আর এ পুস্তিকা নিঃসন্দেহে পবিত্র জীবনী প্রসঙ্গে অধিক জানার ও গভীর অধ্যয়ন করার আগ্রহ ও সুযোগ সৃষ্টি করবে। ইন-শাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে কামনা যে, তিনি যেন এই আমলকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য খালেস করে নিন। আমীন। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

দারুল অত্বান, ইলমী বিভাগ, রিয়ায

মহানবী ﷺ-এর বংশ-পরিচিতি

তাঁর উপনাম ছিল আবুল কাসেম। আসল নাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুর্রা বিন কা'ব বিন লুআই বিন ফিহ্র বিন মালেক বিন নায্র বিন কিনানাহ বিন খুযাইমাহ বিন মুদরিকাহ বিন ইলয়্যাস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'দ বিন আদনান---।

এ পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিকগণ একমত। কিন্তু এর পর থেকে কিছু মতভেদ আছে। অবশ্য আদনান যে ইসমাঈল ﷺ-এর বংশধর, সে ব্যাপারেও সকলে একমত।

মহানবী ﷺ-এর পিতার পরিচয়

তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তাঁকে ইসমাঈল ﷺ-এর মত যবীহ বলা হত। আর তার ইতিবৃত্ত এই যে, আব্দুল মুত্তালিব নযর (মানত) মানলেন যে, তাঁর যদি ১০টি পুত্র সন্তান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে তিনি কা'বার নিকট যবেহ করবেন। অতঃপর ১০টি পুত্র হয়ে গেলে তিনি তাদের মাঝে কাকে যবেহ করবেন তা দেখার জন্য লটারী করলেন। লটারীতে নাম এল

আব্দুল্লাহর। কুরাইশ তাঁকে যবেহ করতে বাধা দিল। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তাহলে আমি আমার নযর কি করব? লোকেরা তাঁকে পরামর্শ দিল যে, আব্দুল্লাহর বদলে ১০টি উঁট কুরবানী করুন। ১০টি উঁট ও আব্দুল্লাহর মাঝে লটারী করা হলে আব্দুল্লাহর নামই বেরিয়ে এল। আব্দুল মুত্তালিব বড় দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এরপর আরো ১০টি উঁট বৃদ্ধি করে লটারী করলেও তাঁরই নাম এল। এইভাবে বৃদ্ধি করতে করতে যখন উঁট ১০০টি পূর্ণ হল, তখন লটারী করে দেখা গেল উঁটের নাম এসেছে। ফলে তাঁর বিনিময়ে ১০০টি উঁট যবেহ করা হল। আর তখন থেকেই কুরাশই তথা আরবে মানুষ হত্যার দন্ড হিসাবে ১০০টি উঁট দেওয়ার আইন প্রচলিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর রসূল ﷺও ইসলামে সেই আইনকে বহাল রাখলেন।

মহানবী ﷺ-এর আম্মার পরিচয়

তাঁর আম্মার নাম আমিনা বিন্তে অহাব বিন আব্দে মানাফ বিন যুহরাহ বিন কিলাব বিন মুর্রাহ। (অর্থাৎ তাঁর আব্বা-আম্মা উভয়েই সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের।)

কুরাইশ মহানবী ﷺকে তাঁর আম্মার এক পিতামহ আবু কাবশার প্রতি সম্পর্ক জুড়ে ব্যঙ্গ করে বলত, ইবনে আবী কাবশাহ। আবু কাবশাহ ছিল খুযাআর একটি লোক, যে কুরাইশদের মূর্তিপূজার

বিরোধিতা করে তারকার পূজা করত। মহানবী ﷺ কুরাইশদের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করলে তাঁকে এ ব্যাপারে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করে বলত, ইবনে আবী কাবশাহ।

মহানবী ﷺ-এর পিতৃব্যগণ

মহানবীর ১১জন পিতৃব্য (চাচা) ছিলেন।

১। আবূ তালেব (আব্দে মানাফ)ঃ (ইনি মহানবীর বড় সহায়ক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর উপর ইসলাম পেশ করা হলে তিনি তা গ্রহণ না করেই মারা যান।)

২। যুবাইর ঃ এই দুইজন আব্দুল্লাহর সহোদর ছিলেন।

৩। আবুল ফায্ল আব্বাস ؓ

৪। হামযাহ ؓ ঃ ইনি মহানবী ﷺ এর দুধ ভাইও ছিলেন।

৫। হারেষ ঃ

৬। হিজ্ল বা হাজ্ল ঃ (গায়দাক)

৭। যিরার ঃ ইনি আব্বাসের সহোদর।

৮। আব্দুল উযযা (আবূ লাহাব)ঃ হিজলের সহোদর।

৯। কুযাম ঃ ইনি ছোট বেলায় মারা যান। ইনি ছিলেন হারেষের বৈপিত্রেয় ভাই।

১০। আব্দুশ শাম্‌শ ঃ

১১। আব্দুল কা'বাহ (মুকাওয়াম) ঃ

(এঁদের মধ্যে কেবল ৪ জন ইসলামের যুগ পান। তাঁদের মধ্যে

২জন) আব্বাস ও হামযাহ ﷺ ইসলামে দীক্ষিত হন। আর এঁদের নাম ছিল ইসলামের অনুকূল। কিন্তু বাকী ২জন আবূ তালেব (আব্দে মানাফ) ও আবূ লাহাব (আব্দুল উয্যা) ইসলাম গ্রহণ করে নি। আর তাদের নামও ছিল ইসলামের প্রতিকূল।) *(ফতহুল বারী ৭/২৩৬)*

মহানবীর ফুফুগণ

তাঁর ফুফু ছিলেন ৬ জন। এঁদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন তাঁর পিতার সহোদরা। আর তাঁরা হলেন ঃ-

১। উম্মে হাকীম ঃ এঁর অপর নাম ছিল বাইযা।
২। আতেকাহ ঃ ইনি মহানবী ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালামাহর আম্মা।
৩। উমাইমাহ ঃ ইনি মহানবী ﷺ-এর পত্নী যায়নাব বিন্তে জাহশের আম্মা।
৪। আরওয়া
৫। বার্রাহ
৬। সাফিয়্যাহ ঃ ইনি হামযাহ ﷺ-এর সহোদরা।

এঁদের মধ্যে কেবল সাফিয়্যাহ ইসলামে দীক্ষিত হন। মতান্তরে আতেকাহও ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী ﷺ-এর বংশ ছিল নির্মল

মহান আল্লাহ তাঁর নবীর পিতাকে (সেই নোংরা জাহেলী যুগের)

ব্যভিচারের ছোবল থেকে রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য, মহানবী জন্মগ্রহণ করেন পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ-আমিনার ঔরসে। মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ ইবরাহীমের বংশ থেকে ইসমাঈলকে, ইসমাঈলের বংশ থেকে কিনানাকে, কিনানা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বানী হাশেমকে এবং বানী হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।" *(মুসলিম)*

সম্রাট হিরাকিল যখন আবূ সুফিয়ানকে মহানবী ﷺ-এর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন, 'তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক।' তা শুনে সম্রাট বলেছিলেন, 'অনুরূপ রসূলগণ নিজ সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত বংশ থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন।' *(বুখারী)*

মহানবীর ﷺ-এর শুভজন্ম

যে বছরে আবরাহা তার হস্তিবাহিনী সহ কাবা আক্রমণ করে সেই বছরের রবীউল আওয়াল মাসের ২, ৮, ৯, ১০ অথবা ১২ তারীখে রোজ সোমবার (৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০ অথবা ২২ এপ্রিল ভোর বেলায়) মক্কার বাতহায় মহানবী ﷺ জন্ম গ্রহণ করেন। সীরাতের উলামাগণ বলেন, মা আমিনা যখন তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন, তখন তিনি তাঁর কোন প্রকার ভার অনুভব করেন নি। অতঃপর যখন তিনি তাঁকে প্রসব করেন, তখন তাঁর সাথে এক প্রকার নূর (জ্যোতি) বের হতে দেখেন; যাতে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যবর্তী

স্থান আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "আমি আল্লাহর নিকট তাঁর লওহে মাহফূযে লিখিত তখনও সর্বশেষ নবী, যখন আদম কাদা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, (আমার নবুঅতের প্রথম বিকাশ ঘটে) আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ, ঈসার তাঁর কওমকে দেওয়া সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন জ্যোতি বের হতে দেখেন যা, শামদেশের অট্টালিকাসমূহকে আলোকিত করেছিল। *(আহমাদ)*

মহানবী ﷺ-এর আব্বার ইন্তিকাল

তিনি মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই তাঁর আব্বার (২৫ বছর বয়সে) ইন্তিকাল হয়। মতান্তরে তাঁর জন্মের কয়েক মাস অথবা এ বছর পরে তাঁর ইন্তিকাল হয়। অবশ্য প্রথম কথাটিই প্রসিদ্ধ।

(মাতা আমিনার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পিতা আব্দুল্লাহ এক বাণিজ্য কাফেলার সাথে শামদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফিরার পথে অসুস্থ হয়ে ইয়াযরিবে (মদীনায়) বনী নাজ্জার গোত্রে অবস্থান কালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেই।)

(জন্মের পর তাঁর দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। তাঁর আকীকা ও খতনা দেওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। বরং মহানবী

ﷺ নবুওয়াত-প্রাপ্তির পর নিজের তরফ থেকে আকীকাহ করেছিলেন বলে জানা যায়। *(সিলসিলা সহীহাহ ২৭২৬ নং)* আর আরবের প্রথা অনুযায়ীই তাঁর খতনা করা হয়েছিল। খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম হওয়ার কথাও প্রমাণিত নয়।)

মহানবী ﷺ-এর দুধপান

জন্মের পর (মায়ের পরে) কয়েক দিন আবূ লাহাবের স্বাধীনকৃত দাসী সুওয়াইবাহ মহানবী ﷺ-কে দুধ পান করান। অতঃপর (আরবের প্রথা অনুযায়ী) বনী সা'দ গোত্রের হালীমা সাদিয়ার দুধ পান করেন। এঁর নিকট তিনি প্রায় ৪ বছর অবস্থান করেন। এখানেই থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট দুই ফিরিশ্তা আসেন এবং বক্ষ বিদারণ করে তাঁর আত্মার মন্দ ও শয়তানের অংশকে বের করে ফেলে (হৃদয়কে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে দেন।) এই ঘটনার পর হালীমা ভয় পান এবং শিশুকে নিজ মাতার কাছে ফিরিয়ে দেন।

মহানবীর ﷺ-এর আম্মার ইন্তিকাল

মহানবী ﷺ এর বয়স তখন ছয় বছর। এ সময় (আব্বার কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দাসী উম্মে আইমান) ও এতীম শিশুকে সঙ্গে করে মা বের হলেন মায়ের বাড়ি ইয়াষরিব (মদীনা)। এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফিরার পথে মা আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন

এবং আবওয়া নামক জায়গায় এতীম শিশুকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন।

মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কার পথে যাওয়ার সময় আবওয়া জায়গাতে এসে মায়ের কথা স্মরণ হতে মহানবী ﷺ তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাঁকে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিলেন। (কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দিলেন না।) মহানবী ﷺ সেখানে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে কাঁদতে লাগলেন তাঁর সাহাবাগণ। এখানে তিনি বললেন, "তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ তা পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম)*

আম্মার মৃত্যুর পর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন তাঁর পিতার ওয়ারেস সূত্রে পাওয়া ও তাঁর স্বাধীন করা দাসী উম্মে আইমান) এবং তাঁর পরিচর্যা ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

কিন্তু তাঁর বয়স আট বছর হতেই দাদারও ইন্তিকাল হয়ে গেল। তিনি মহানবী ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবকে তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়ে অসিয়ত করে গেলেন। আবূ তালেব তাঁর যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করলেন। নবী হয়ে প্রেরিত হওয়ার পর তিনি তাঁর তবলীগের কাজে যথাযথ সাহায্য ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা করলেন। অথচ তিনি নিজে শির্কের ধর্মেই অবিচলিত থাকলেন। মরণ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবুও মহানবী ﷺকে সহযোগিতা করার খাতিরে মহান আল্লাহ তাঁর আযাব হাল্কা করে

দিলেন। বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "জাহান্নামীদের সব চাইতে হাল্কা আযাবের লোক হবেন আবূ তালেব। তাঁর উভয় পায়ে থাকবে এক জোড়া আগুনের জুতা। আর তার তাপেই তাঁর মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।" *(মুসলিম)*

উক্ত চাচার সাথে মহানবী ﷺ ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামদেশ সফর করেন (এবং সেখানেই খৃষ্টান ধর্মযাজক বুহাইরা তাঁকে নবীরূপে চিনতে পারেন)।

(এই সময় উপার্জনের জন্য তিনি সামান্য মজুরীর বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসাবে কাজ করেন।)

মহানবী ﷺ-এর পবিত্রতা ও সততা

মহান আল্লাহ নিজ নবীকে শিশুবেলা থেকেই জাহেলী যুগের প্রত্যেক ত্রুটি, পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও দূর রেখেছেন। তাঁকে দান করেছিলেন প্রত্যেক সদ্‌গুণ ও সচ্চরিত্রতা। তিনি কখনো কোন প্রতিমার সামনে মাথা ঝুকান নি। কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হন নি। কোন গায়িকার গান শুনেন নি। আর এ জন্যই তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট 'আল-আমীন' আমানতদার, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। যেহেতু লোকেরা তাঁর পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সততা ও আমানতদারীর ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। এমন কি তাঁর ৩৫ বছর বয়সে কুরাইশরা যখন কা'বা পুনর্নির্মিত করে তখন 'হাজরে আসওয়াদ' সস্থানে কে রাখবে তা নিয়ে কলহ বাধে। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা বলতে লাগল, 'হাজরে আসওয়াদ

আমরাই রাখব।’ শেষ পর্যন্ত তাদের আপোসে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। কিন্তু পরক্ষণে তারা একমত হল যে, আগামী কাল সকালে সর্বপ্রথম যে এখানে উপস্থিত হবে, তারা তারই উপর এই বিবাদের মীমাংসা-ভার অর্পণ করবে। বলা বাহুল্য, সকালে সর্বপ্রথম এসে উপস্থিত হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তারা তাঁকে দেখে বলল, ‘এ তো সেই আল-আমীন।’ সুতরাং তারা তাঁকে বিচারক বলে মেনে নিল। তিনি মীমাংসার জন্য একটি কাপড় বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদকে কাপড়ের মাঝে রাখলেন এবং বিবদমান গোত্রের নেতাদেরকে তার এক একটি প্রান্ত ধরে তুলে কা’বার কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি নিজ হাতে তুলে পাথরটিকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। *(আহমাদ, হাকেম)* (আর এইভাবে তিনি সুকৌশলের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ছোবল থেকে কুরাইশকে রক্ষা করলেন।)

ফুজ্জার যুদ্ধ

২০ (অথবা ১৫) বছর বয়সে মহানবী ﷺ ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধ ছিল কুরাইশ ও কাইস আইলানের মধ্যে। এ যুদ্ধকে ফুজ্জার বলার কারণ এই যে, তাতে বহু হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা হয়। (আর ফুজ্জার মানে হল পাপিষ্ঠদল।)

মহানবী ﷺ-এর বিবাহ

২৫ বছর বয়সে মহানবী ﷺ খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ (নামক

সম্ভ্রান্তা-সম্পদশালিনী ও ব্যবসায়ী বিধবা মহিলা)র বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে তাঁর দাস মাইসারার সাথে সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানে মাইসারাহ মহানবী ﷺ-এর ব্যবহার, সততা, (ব্যবসায় লাভ), আমানতদারী ও গম্ভীরতার সকল ব্যাপার দেখে ও জেনে মুগ্ধ হন। সেখান থেকে ফিরার পর সে সমস্ত কথা মাইসারাহ তাঁর মালিক খাদীজাকে জানান। তা শুনে তিনিও তাঁর প্রতি অভিভূতা হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে পাওয়ার বাসনা মনে মনে পোষণ করেন।

(অতঃপর সখীর যোগাযোগে ৪০ বছর বয়স্কা বিধবা প্রৌঢ়ার সাথে ২৫ বছর বয়স্ক যুবকের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।)

সুন্দর চরিত্র ও সুমধুর ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করে তিনি সাংসারিক জীবনও অতিবাহিত করতে লাগলেন। পরিশেষে (১৫ বছর পার হওয়ার পর) মহান আল্লাহ তাঁকে নবুঅতের নিয়ামত ও রিসালতের সম্পদ দিয়ে সম্মানিত ও সমৃদ্ধ করলেন। তখন তিনি নবী ও রসূলরূপে নির্বাচিত হলেন।

মহানবী ﷺ-এর নবুঅত-প্রাপ্তি

যখন মহানবী ﷺ ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নবুঅত ও রিসালতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। (মক্কার নূর পর্বতের সুউচ্চ শিখরে হিরা গুহায় তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন।) রমযান মাসের (২১, ২৫ বা) ২৭ তারীখে

সোমবার রাত্রে জিবরীল ﷺ সেখানে প্রথম অহী নিয়ে অবতীর্ণ হন। আর তাঁর উপর যখন অহী অবতীর্ণ হত, তখন তিনি বড় কষ্টবোধ করতেন, তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত এবং কপালে ঘাম ঝরতে শুরু হত।

জিবরীল তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে (রেশমী বস্ত্রখন্ডে লিখিত কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে) বললেন, 'আপনি পড়ুন।' তিনি বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" অতঃপর ফিরিশ্তা তাঁকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন। এতে তিনি কষ্টবোধ করলেন। ফিরিশ্তা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'আপনি পড়ুন।' তিনি আবারও বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" অতঃপর তৃতীয়বারে অনুরূপ পড়তে আদেশ করে বললেন,

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝ ﴾

অর্থাৎ, পড়ুন আপনার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঘনীভূত রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রভু মহাদয়ালু। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন; শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। *(সূরা আলাক ১-৫আয়াত)*

এই ঘটনার পর তিনি ভীত-কম্পিত অবস্থায় খাদীজার নিকট ফিরে এলেন। তাঁকে সমস্ত খবর খুলে বলে (চাদর ঢাকা দিতে বললেন)। স্ত্রী খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বললেন, 'আপনি এ ঘটনায় সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কক্ষনো না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কোন দিন লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো

আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, সত্য কথা বলেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।' *(বুখারী + মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, খাদীজাই (রাঃ) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।

অরাকা বিন নাওফালের সাথে সাক্ষাৎ

অতঃপর খাদীজা (রাঃ) মহানবী ﷺ-কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা বিন নাওফালের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। (তাওরাত-ইঞ্জীল তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন।) আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে গুহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অরাকা বললেন, 'ইনি তো সেই নামূস (ফিরিশ্তা জিবরীল), যিনি মূসার নিকট অবতীর্ণ হতেন। হায়! যেদিন আপনাকে আপনার স্বজাতি দেশ থেকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত ও যুবক থাকতাম।'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "তারা আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?" অরাকা বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার মত যে কেহই এ সত্য আনয়ন করেছেন, তিনিই নির্যাতিত হয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করব।'

কিন্তু এর অল্পকাল পরেই অরাকা মৃত্যুবরণ করেন। *(বুখারী + মুসলিম)*

অহী বন্ধ অতঃপর প্রচারের আদেশ

এরপর কিছুকাল অহী বন্ধ থাকে। আল্লাহর রসূল ﷺ এইভাবেই কয়েকদিন কাটার পর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অহী অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁর দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি বোধ এত বেশী বৃদ্ধি পেল যে, তিনি পর্বত-শীর্ষে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু যখনই তিনি পর্বত শিখরে আরোহন করতেন, তখনই জিবরীল ﷺ তাঁর দৃষ্টিগোচর হতেন। তিনি তাঁকে বলতেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্যই আল্লাহর রসূল।' এ কথা শুনে তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যেত।

অতঃপর একদিন ফিরিশ্তা জিবরীল ﷺ-কে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তা দেখে তিনি ভীত-বিস্মিত হলেন এবং স্ত্রী খাদীজার নিকট এসে বললেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" (তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল।) ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তাঁর উপর এই আয়াতসমূহ অবতীণ করলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤ ﴾

অর্থাৎ, হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠ ও সতর্ক কর। তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার লেবাস (বা আমল) পবিত্র কর। *(সূরা মুদ্দাষ্‌যির ১-৪ আয়াত)*

সুতরাং এই আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তাঁকে আপন স্বজাতিকে সতর্ক করতে এবং তাঁর দিকে দাওয়াত দিতে আদেশ দিলেন। অতএব তিনি সর্বতোভাবে প্রস্তুতি নিলেন এবং আল্লাহর আনুগত্য পালনে যথার্থ চেষ্টা শুরু করে দিলেন।

প্রকাশ্যে দাওয়াত

৩ বছর ধরে মহানবী ﷺ নবুঅতের কথা গোপনে প্রচার করলেন। অতঃপর তাঁর নিকট এই নির্দেশ অবতীর্ণ হল,

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۝٩٤ ﴾

অর্থাৎ, তুমি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৪ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন।

অতঃপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ۝٢١٤ ﴾

অর্থাৎ, তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। *(সূরা শুআরা ২১৪ আয়াত)* তখন তিনি সাফা পর্বতে চড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "হুশিয়ার! হুশিয়ার!" লোকেরা বলল, 'কে চিৎকার করে সতর্ক করে?' কেউ কেউ বলল, 'মুহাম্মাদ।' তিনি বলতে লাগলেন, "ওহে বানী অমুক! ওহে বানী অমুক! ওহে বানী অমুক! ওহে বানী আব্দে মানাফ! ওহে বানী আব্দুল মুত্তালিব!"

সতর্কের এই আহবান শুনে সকল গোত্র থেকে লোকেরা তাঁর নিকট জমা হল। তিনি বললেন, "আমি যদি বলি, অশ্বারোহী এক শত্রুদল এই পাহাড়ের (অপর দিকে) নিম্নদেশে (আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে) বের হয়েছে, আপনারা কি আমার সে কথায় বিশ্বাস করবেন?" সকলে বলে উঠল, 'আমাদের অভিজ্ঞতায় আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনি নি।' তিনি বললেন, "তাহলে শুনুন! আমি আপনাদেরকে কঠোর শাস্তি আগত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করছি।"

তাঁর এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলে উঠল, 'সর্বনাশ হোক তোর! এ জন্যই কি আমাদেরকে জমায়েত করেছিস?' অতঃপর সে উঠে প্রস্থান করল। আর এরই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হল সূরা লাহাব ঃ

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ ﴾

অর্থাৎ, আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে।-- *(বুখারী + মুসলিম)*

এরপর কুরাইশ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির উপর অত্যাচার শুরু করে দিল, যে মহানবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে। দুর্বল মুমিনদেরকে

শাস্তি দিতে লাগল। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মহান আল্লাহ তাঁর চাচার মাধ্যমে সকল অত্যাচার থেকে রক্ষা করলেন। যেহেতু তাঁর চাচা আবূ তালেব ছিলেন কুরাইশের মধ্যে ভদ্র ও মান্যগণ্য ব্যক্তি। তাঁরই কারণে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে হঠাৎ করে কিছু করার দুঃসাহসিকতা তাদের ছিল না। কেননা, তারা জানত যে, তিনি নবী ﷺ-কে কতটা ভালোবাসেন।

হাবশার প্রতি হিজরত

মহানবী ﷺ-এর সহচরবর্গের প্রতি যখন অত্যাচারের পরিধি বাড়তে লাগল, তখন তিনি তাঁদেরকে হাবশা (আবিসিনিয়া)তে হিজরত করতে আদেশ করলেন। সুতরাং তাঁরা নবুঅতের পঞ্চম বছরে সেখানে হিজরত (আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ) করলেন। দুই মাস সেখানে অবস্থান করে পুনরায় মক্কায় শওয়াল মাসে ফিরে এলেন। তারপরও যখন মুমিনদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন আবার দ্বিতীয়বারের জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে আদেশ দিলেন।

অতঃপর নবুঅতের ষষ্ঠ বছরে মহানবী ﷺ-এর চাচা হামযাহ এবং উমার বিন খাত্তাব ؓ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর উভয়ের ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহাবিজয়।

বয়কট ও অবরোধ

(নবুঅতের সপ্তম বছরের শুরুতে) কুরাইশ যখন আবূ তালেবকে লক্ষ্য করল যে, তিনি নিজ ভাতিজা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহায্য করতে ও তাঁকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর এবং তাঁকে তাদের কাছে সোপর্দ করতে মোটেই রাযী নন, তখন তারা বনী হাশেম পুরো গোত্রকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সুতরাং তারা এ মর্মে একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করল। তাতে বলা হল যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে হত্যার জন্য তাদেরকে সমর্পণ না করে দেওয়া পর্যন্ত বনী হাশেমের সাথে মোটেই সন্ধি করবে না। অতঃপর তাঁদেরকে 'শি'বে আবী তালেব' (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু জায়গা)তে অবরোধ করে রাখল। তাদের সাথে বাজার সহ সর্বপ্রকার বয়কট বহাল করল। এর ফলে বনী হাশেমের সংকট চরমভাবে বৃদ্ধি পেল। ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ল গোত্রের সমস্ত লোক। এমনকি (খাদ্য ও পানীয়র অভাবে) ক্ষুধার তাড়নায় মহিলা ও শিশুদের ক্রন্দনরোল বাইরে থেকেও শোনা যেত। (এই অবস্থায় তাঁরা চামড়া ও গাছের পাতাও খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।)

অবরোধ লাগাতার ৩ বছর বহাল থাকল। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ, তাঁর চাচা আবূ তালেব এবং বনী হাশেম সুদৃঢ় পদে এহেন সংকটের বিস্ময়কর মোকাবিলা করলেন। অতঃপর (বনী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু) শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ ঐ কুখ্যাত বয়কটের চুক্তিনামা বাতিল ঘোষণা করলেন।

এর ফলে নবুঅতের নবম বর্ষে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর গোত্র সহ সেই অবরোধ সংকট থেকে মুক্তি পেয়ে বের হয়ে এলেন। তখন

তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

দুঃখের বছর

কঠিন অবরোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার ৯ মাস পর মহানবী ﷺ-এর নবুঅতের দশম বর্ষে তাঁর চাচা আবূ তালেব (ইসলাম গ্রহণ না করেই) মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আর এর ঠিক ২ মাস পরেই প্রেমময়ী স্ত্রী খাদীজাও ৬৫ বছর বয়সে আদর্শ স্বামী মহানবী ﷺ ছেলেমেয়েদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। মহানবী ﷺ চলার পথে (আল্লাহর পরপর) সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক দুই মহান ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে বসলেন।

মহানবী ﷺ-এর ধৈর্যের মহাপরীক্ষা

চাচা আবূ তালেবের মৃত্যুর পর আল্লাহর নবী ﷺ-এর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে মহাপ্রতিদানের আশা রেখে তিনি সকল কষ্ট বরণ করে নিলেন। সংকটের বোঝা মাথায় নিয়েও তিনি ছোট-বড়, স্বাধীন-পরাধীন (ক্রীতদাস) এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই মহান আল্লাহর দিকে আহবান করতে লাগলেন। তাতে প্রত্যেক গোত্র থেকে আল্লাহ যাঁর হেদায়াত এবং ইহ-পরকালে কল্যাণ চেয়েছিলেন তিনি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, আবূ তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশদল

আল্লাহর নবী ﷺ-কে জীবনান্তকর কষ্ট দিতে শুরু করল।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত যে, একদা তিনি (কা'বার পাশে) নামায পড়ছিলেন। অনতি দূরে পড়ে ছিল (যবেহ করার পর) উঁটনীর গর্ভাশয়। (মহিলার যেটাকে ফুল বলা হয়। আবূ জাহলের আদেশক্রমে) উকবাহ বিন আবী মুআইত্ব তা উঠিয়ে এনে সিজদারত মহানবী ﷺ-এর পিঠে চাপিয়ে দিল। তিনি সিজদায় রত থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যা ফাতিমা এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরিয়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি উঠে নামায শেষ করে কুরাইশের জন্য বদ্দুআ করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশের ঐ গোষ্ঠীকে ধ্বংস কর।" *(বুখারী + মুসলিম ১৭৯৪নং)*

বুখারীতে আছে যে, একদা উক্ত উকবাহ বিন আবী মুআইত্ব মহানবী ﷺ-এর বাহুতে ধরে তাঁর ঘাড়ে চাদর পেঁচিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করে ফেলে। তা দেখে আবূ বাক্র رضي الله عنه ছুটে এসে তাকে সরিয়ে ফেলে বলেন, তুই কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাস, যে 'আল্লাহ আমার প্রভু' বলে?

মহানবী ﷺ-এর তায়েফ যাত্রা

মহানবী ﷺ-এর দুই ডানা চাচা আবূ তালেব ও স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) হারানোর পর যখন তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল, তখন তিনি (নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোর সন্ধানে) তায়েফ সফর করেন। সেখানে পৌঁছে সাকীফ গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেখানেও তিনি

তাদের কাছে থেকে ঔদ্ধত্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সেখানে তিনি (১০ অথবা) ৩০ দিন অবস্থান করলেন। পরিশেষে তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করল। এমনকি তাতে তাঁর পায়ের গোড়ালীদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক্ষণে তিনি মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ফিরার পথে তিনি তায়েফ থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত এক আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নেন এবং সেখানে দুই হাত তুলে এক প্রসিদ্ধ দুআ করেন।)

তিনি বলেন, "আমি তায়েফ থেকে প্রস্থান করলাম। সে সময় আমি নিদারুন বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। 'ক্বারনুষ ষাআলিব' (বর্তমানে আস-সাইলুল কাবীর; যা রিয়ায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদের মীকাত)-এ এসে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হই। মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। লক্ষ্য করে দেখি তাতে জিবরীল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।' অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।

আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত করে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।' কিন্তু আমি বললাম, "না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। *(বুখারী + মুসলিম)*

একদল জিনের ইসলাম গ্রহণ

মহানবী ﷺ-এর বয়স যখন ৫০ বছর ৩ মাস হল, তখন তাঁর নিকট নাসীবীন নামক জায়গার একদল জিন এসে উপস্থিত হয় এবং তারা তাঁর নিকট মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে বলে, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি; যা সঠিক পথনির্দেশ করে; আর তার জন্যই আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করি।' এরই বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা জিন অবতীর্ণ করেন।

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾

অর্থাৎ, বল, অহীর মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জিনদের একটি দল সযত্নে (কুরআন পাঠ) শ্রবণ করেছে---। *(সূরা জিন ১নং*

আয়াত, বুখারী)

(এর পর চন্দ্র দ্বিখন্ড হওয়ার অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কিন্তু তা দেখে লোকেরা মহানবী ﷺ-কে যাদুকর বলে অভিহিত করে।)

(নবুঅতের একাদশ বর্ষের শওয়াল মাসে মহানবী ﷺ-এর সাথে আবূ বাক্‌র ﷺ-এর ছয় বছর বয়সের কন্যা আয়েশা (রাঃ)-এর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়।)

ইসরা ও মি’রাজ

(ইসরা মানে নৈশভ্রমণ।) এই বছরে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তাঁর মনকে (সান্ত্বনিত করার জন্য) তাঁর দেহাত্মা সহ মাসজিদুল হারামের যমযমের কুঁয়া ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থান থেকে (সীনাচাক করার পর) এক রাতে জিবরীল ﷺ-এর সাহচর্যে বুরাকে চড়িয়ে ফিলিস্তীনের বায়তুল মাকদেস ভ্রমণ করানো হয়। সেখানে নেমে (বুরাক বেঁধে) সমবেত আম্বিয়াদের ইমামতি করে নামায পড়েন। (এই সফরকে ইসরা বলা হয়।)

(মি’রাজ মানে সোপান। সোপানে চড়ে ঊর্ধ্বে গমন করাকে মি’রাজ বলা হয়।) বায়তুল মাকদেসে নামায পড়ে ঐ রাতেই নিম্ন (প্রথম) আসমানে এবং সেখান থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরপর সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। প্রত্যেক আসমানে আম্বিয়াগণকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর তাঁকে ‘সিদরাতুল মুন্তাহা’ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি জিবরীল

ﷺ-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে দর্শন করলেন; যে আকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। জান্নাত-জাহান্নাম দেখলেন। (তিনি আল্লাহর নিকটবর্তী হলেন। নূরের পর্দার অন্তরাল থেকে) আল্লাহ তাঁর উপর ৫ অক্তের নামায ফরয করলেন। এ সময় মহানবী ﷺ-এর বয়স ছিল ৫১ বছর ৯ মাস।

(উভয় সফরে তিনি মহান আল্লাহর বড় বড় নিদর্শন দর্শন করেন। ফিরে এসে সে ঘটনা খুলে বললে কাফেরদল হেসে উড়িয়ে দেয়। আবূ বাক্র সেসব কথা শোনামাত্র বিশ্বাস করেন এবং তার ফলে তাঁর উপাধি হয় 'সিদ্দীক।')

বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের দাওয়াত

আল্লাহর রসূল ﷺ বিভিন্ন জনসমাবেশ স্থলে; ঘরে-ঘরে, উকায-মাজান্ন ও যুল-মাজায বাজারে পৌঁছে নিজেকে লোকেদের কাছে পেশ করে তাদেরকে আল্লাহ আযযা অজাল্লার দিকে আহবান করতে লাগলেন।

একদা যুল-মাজায বাজারে বের হয়ে লোকদেরকে বললেন, "হে লোক সকল! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই)' বল, তোমরা সফল হবে।"

গোত্রের লোকেদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বলতেন, "হে বানী অমুক! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত রসূল। আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর। যাতে আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা আমি

কার্যকর করতে পারি।”

কিন্তু তাঁর কথা বলা শেষ হতে না হতেই তাঁর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠত, ‘তোমরা ওর কথা শুনো না। ওর অনুসরণ করো না। এ আসলে তোমাদেরকে (তোমাদের পূজনীয়) লাত ও উযযাকে বর্জন করতে বলতে চায়।’ *(আহমাদ)*

একদা আরাফাতের ময়দানে (আরাফার দিনে) লোকেদের উপর নিজেকে পেশ করে বললেন, “কেউ কি আছে, যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাবে? কুরাইশ আমাকে আল্লাহ আযযা অজাল্লার বাণী প্রচার করতে বাধা দিয়েছে।” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ)*

মদীনার আনসারদের ইসলাম গ্রহণ

আওস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ মদীনার ইয়াহুদীদের কাছে শুনতেন যে, বর্তমান যুগেই এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁরা ইয়াহুদ ছাড়া অন্যান্য আরবদের মত হজ্জ করতেন। অতএব হজ্জের মৌসমে যখন তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করছেন, তখন তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অবস্থা ও দিক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন। তাঁরা এক অপরকে বললেন, ‘আল্লাহর কসম! হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা জানো যে, ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর আগমন নিয়ে ইয়াহুদীরা তোমাদেরকে ধমক দিয়েছে। সুতরাং কোনক্রমেই তারা যেন তাঁর অনুসরণ করার ব্যাপারে তোমাদের অগ্রগামী না হতে পারে।’

আক্বাবার প্রথম বায়আত

অতএব (মিনার) আকাবার নিকটে ৬ জন খাযরাজী আনসার আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান জানালেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মদীনায় ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরাও লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে ইসলাম বিকাশ লাভ করতে লাগল। পরিশেষে মদীনার প্রত্যেক ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেল। অতঃপর পরবর্তী বছরে (হজ্জের সময়) খাযরাজ গোত্রের ১০ জন এবং আওস গোত্রের ২ জন সর্বমোট ১২ জন লোক মক্কায় এসে আকাবার নিকট সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা সকলেই ইসলামের উপর তাঁর কাছে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করলেন। তিনি মুসআব বিন উমাইর ﵁-কে ইসলামের শিক্ষক হিসাবে তাঁদের সাথে প্রেরণ করলেন।

আক্বাবার দ্বিতীয় বায়আত

তৃতীয় বছরে (হজ্জের মৌসমে) আনসারদের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা এসে মহানবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন; এঁদের মধ্যে ১১ জন লোক আওস গোত্রের। তাঁরা সকলে ইসলাম ও জিহাদের উপর বায়আত করলেন। বায়আত পূর্ণ হলে আল্লাহর

রসূল ﷺ তাঁর সাথী-সঙ্গী মুসলিমদেরকে মদীনায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। সে আদেশ পেয়ে জামাআত জামাআত হয়ে সকলে মদীনায় হিজরত করে গেলেন।

মহানবী ﷺ-এর হিজরত
প্রতিষ্ঠালাভের সূচনা
(প্রথম বর্ষ)
ষড়যন্ত্র

যখন মুশরিকরা দেখল যে, মহানবী ﷺ-এর সঙ্গীগণ মদীনায় পালিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাদের ভয় হল যে, হয়তো বা আল্লাহর রসূল ﷺ-ও তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন এবং তার ফলে মদীনা মুমিনদের একটি সামরিক-ঘাঁটিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর তাকেই কেন্দ্র করে তাঁরা মক্কায় শির্কের ঘাঁটিতে (তাদের উপর) আক্রমণ চালাবেন। অথবা তাঁরা তাদের সেই বাণিজ্যিক কাফেলার

জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবেন, যা লোহিত সাগরের উপকূল বেয়ে শাম দেশ যাতায়াত করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই মুশরিকরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে হত্যা করে ইসলামী দাওয়াত থেকে চিরতরের জন্য রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে একমত হল।

মুশরিকরা 'দারুন নাদওয়াহ' (সংসদ ভবনে) বৈঠকে বসল। বড় বড় ব্যক্তিত্ব তথা নেতৃমন্ডলীর বিচার-বিবেচনা করার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একটি করে বীর যুবক বেছে নিয়ে তাদেরকে একটি করে ক্ষুরধার তরবারি দান করা হবে। অতঃপর তারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপর একত্রে এক ব্যক্তির মত আঘাত হেনে সকলে মিলে তাঁকে হত্যা করবে। এরূপ করতে পারলে তারা তাঁর ব্যাপারে শান্তি পেয়ে যাবে। আর তাঁর খুনের বদলা এসে পড়বে সকল গোত্রের উপর। অতএব বানী আব্দে মানাফ ঐ সকল গোত্রের সকল লোককে মহানবী ﷺ-এর খুনের বদলে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। বাধ্য হয়ে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে অর্থদন্ড গ্রহণ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সমাধান তাদের থাকবে না।

হিজরতের অনুমতি

এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের পর জিবরীল ﵇ মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে সংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, কুরাইশ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়েছে। আর মহান আল্লাহ আপনাকে মক্কা ছেড়ে

বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

জিবরীল আরো বললেন যে, তিনি যেন আজকের রাতে নিজ বিছানায় না ঘুমান।

সুতরাং সংবাদ জেনে যোহরের সময় মহানবী ﷺ আবূ বাক্র সিদ্দীকের নিকট তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করে বললেন, "আমাকে (মক্কা ছেড়ে) বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

আবূ বাক্র ؓ বললেন, 'আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার সঙ্গী হব?'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি স্বগৃহে ফিরে এলেন।

মহানবী ﷺ-এর বাড়ি ঘেরাও

সন্ধ্যাবেলায় সেই পাপিষ্ঠরা নিজেদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘৃণ্যতম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কল্পে; অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে হত্যা করার মানসে জমায়েত হল। (অন্ধকার নেমে আসতেই) তারা মহানবী ﷺ-এর বাড়ির দরজায় তরবারি হাতে খাড়া হয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে তারা তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল যে, যখনই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন, তখনই তারা অতর্কিতে তাঁর উপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু তারা ভুলে গেল যে, তারা নিজেদের কোন লাভ-নোকসানের মালিক নয় এবং আল্লাহ যতটুকু তাঁর ভাগ্যে লিখেছেন ততটুকু ছাড়া তাঁর রসূল ﷺ-এরও কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে

সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন কাফেরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার জন্য অথবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী। *(সূরা আনফাল ৩০ আয়াত)*

এই মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহর রসূল ﷺ আলী বিন আবী তালেবকে তাঁর বিছানায় ঘুমাতে আদেশ করলেন। তাঁকে তাঁর (সবুজ) চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুতে বললেন এবং তাঁকে নিশ্চিন্তও করে দিলেন যে, তাঁর কোন প্রকার কষ্ট বা ক্ষতি হবে না।

তারপর মহানবী ﷺ আল্লাহর তত্ত্বাবধানে পরিবেষ্টিত হয়ে বাড়ি থেকে বের হলেন। তিনি এক মুঠি ধুলো নিয়ে কাফেরদের কাতারের কাছাকাছি হয়ে তাদের মাথায় ছড়িয়ে দিলেন। মহান আল্লাহ এরই মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন। ফলে তারা তাঁকে দেখতে পেল না। সেই সাথে মহানবী ﷺ এই আয়াত পড়তে লাগলেন,

﴿ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির উপর আবরণ রেখেছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না। *(সূরা ইয়াসীন ৯ আয়াত)*

সুতরাং মহানবী ﷺ তাদের দৃষ্টির অগোচরে বের হয়ে আবূ বাকরের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

এই সময় এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর বাড়ি ঘেরাওরত মুশরিকদের নিকটে গিয়ে বলল, 'তোমরা কার অপেক্ষা করছ?' তারা বলল, 'আমরা মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি।' লোকটি বলল, 'তিনি তো তোমাদের মাথায় ধুলো দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে তোমাদের চোখের সামনে বেয়ে পার হয়ে গেছেন।'

কিন্তু এ খবরে তারা বিশ্বাস করল না। ফলে জায়গা না ছেড়ে সকাল পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল।

অতঃপর যখন আলী বিন আবী তালেব মহানবী ﷺ-এর বিছানা থেকে উঠলেন, তখন মুশরিকরা নিজেদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কথায় একীন করল। তারা তাঁকে মহানবী ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যাপারে কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

ষওর গিরিগুহার পথে

মুশরিকদের পৌঁছনোর আগে আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ (রাতে রাতেই) আবূ বাকরের বাড়ি সত্বর ত্যাগ করলেন। তাঁর যাত্রার গতিমুখ ছিল মদীনার দিকে। কিন্তু তিনি পরিচিত প্রধান পথ পরিহার করে মক্কার দক্ষিণ দিকে (উল্টা দিকে) এক ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন। এই পথে (৫ মাইল হেঁটে) সওর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। (এখানে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে গুহায় আশ্রয় নেবেন ভাবলেন। কিন্তু পাহাড়ের উপর

গুহায় পৌঁছনোর পথ ছিল অত্যন্ত কঠিন।) আবূ বাক্‌র ﷺ তাঁকে পিঠে তুলে নিয়ে পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন। এই গুহাই ইতিহাসে 'গারে ষওর' বা 'ষওর গুহা' নামে সুপ্রসিদ্ধ।

এদিকে লাগাতার খোঁজাখুঁজির পর মুশরিকরা উক্ত গুহার দ্বারপ্রান্তেও উপস্থিত হল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রতিহত করলেন।

বুখারী গ্রন্থে আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আবূ বাক্‌র ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম। উপর দিকে মাথা তুলে দেখতেই মুশরিকদের পা আমার নজরে পড়ল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! ওদের কেউ যদি তার মাথা নিচের দিকে নামায়, তাহলে তো আমাদেরকে দেখে নেবে।' নবী ﷺ বললেন, "সেই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ?" এরপর অনুসন্ধায়ীরা পিছন হটে হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

উক্ত গুহায় মহানবী ﷺ আবূ বাকরের সাথে ৩ দিন অবস্থান করলেন। পরিশেষে তাঁদের ব্যাপারে অনুসন্ধান শিথিল হয়ে গেল।

আবূ বাকরের ছেলে আব্দুল্লাহ প্রত্যেক রাত্রে অতি সংগোপনে তাঁদের নিকট কুরাইশের খবর নিয়ে আসতেন এবং তাঁদের সাথেই গুহায় রাত্রিযাপন করতেন।

আবূ বাকরের স্বাধীনকৃত দাস আমের বিন ফুহাইরাহ তাঁদের জন্য দুধ ও খাবার নিয়ে আসতেন। আব্দুল্লাহ গুহা ত্যাগ করার পর আমের নিজ ছাগপাল নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে (মক্কার পথে) কিছু দূর যেতেন। যাতে গুহায় যাওয়ার পদচিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে এবং

তা দেখে গুহায় কেউ আছে বলে ধারণা না জন্মাতে পারে।

মদীনার পথে

অনুসন্ধানের কাজ যখন একেবারে স্তিমিত হয়ে এল এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-কে পাওয়ার ব্যাপারে কুরাইশ নিরাশ হয়ে পড়ল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ ও আবূ বাক্র মদীনা বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। পথ-নির্দেশের জন্য ভাড়া করা হল আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত্ব লাইষী নামক এক রাহবার। আব্দুল্লাহ সে অঞ্চলের বিভিন্ন পথ-ঘাট ও উপত্যকা প্রসঙ্গে বড় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল।

সে কুফফারে কুরাইশদের (শির্কী) ধর্মাবলম্বী থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ তার মাঝে সততা ও বিশ্বস্ততা লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাকে রাহবাররূপে ভাড়া করেছিলেন।

যাই হোক, তাঁদের তিন রাত্রি গুহায় অতিবাহিত করার পর আব্দুল্লাহ নির্ধারিত সময়ে তার বাহন সহ উপস্থিত হল। আল্লাহর রসূল ﷺ ও আবূ বাক্র ؓ সফর শুরু করলেন। তাঁদের সফরের সঙ্গী হলেন আমের বিন ফুহাইরাও। আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত্ব তাঁদেরকে নিয়ে মদীনার (সাধারণ পথে না গিয়ে) লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথে চলতে লাগল। এটি ছিল নবুঅতের চতুর্দশ বছর এবং প্রথম হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম রাত্রি (মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২খ্রিষ্টাব্দ সোমবার)।

সুরাক্বাহ বিন মালেকের কাহিনী

সুরাক্বাহ বিন মালেক (শোনা খবর অনুযায়ী) দূর থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাফেলাকে দেখতে পেলেন। মহানবী ﷺ-কে ধরে আনার উপর কুরাইশের ঘোষিত পুরস্কার (১০০ উট) লাভের লোভে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁদের প্রতি অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁদের নিকটবর্তী হতেই তাঁর ঘোড়ার সামনের দুটি পা মাটিতে ধসে গেল। তিনি ঘোড়াকে ধমক দিলে ঘোড়া কোন রকম উঠে আবার চলতে লাগল। কিন্তু এবারেও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকটবর্তী হতেই তাঁর ঘোড়ার সামনের পা দুটি মাটিতে ধসে গেল। তখন সুরাক্বাহ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে মোটেই সক্ষম নন। পরিশেষে তিনি তাঁদেরকে নিরাপদ হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন এবং তাঁর খাদ্য-সামগ্রী ও রসদ তাঁদের নিকট পেশ করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে তাঁদের খবর লোকেদের কাছে গোপন রাখতে বললেন। (তাঁর চাওয়া মতে তাঁকে এক নিরাপত্তা-নামা লিখে দিলেন।) এরপরে সুরাক্বাহ তাঁদের ব্যাপারে লোকেদেরকে প্রতিহত করতে লাগলেন।

উম্মে মা’বাদ খুযাইয়্যার কাহিনী

পথিমধ্যে আল্লাহর রসূল ﷺ ও আবূ বাক্র رضي الله عنه (অতিথি সেবাপরায়ণা মহিলা) উম্মে মা’বাদের তাঁবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করলেন, তাঁর কাছে কোন খাবার আছে কি না? কিন্তু সে বছরটি ছিল অনাবৃষ্টির বছর। তাঁর নিকট কেবল একটি দুর্বল বকরী দেখতে পেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ বকরীটি দোহন করার অনুমতি চাইলেন। উম্মে মা'বাদ তাঁকে অনুমতি দিলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ 'বিসমিল্লাহ' বলে দুআ করে নিজ হাত বকরীর বাঁটে হাত রাখলেন। সাথে সাথে সেই (দুর্বল বকরীর শুষ্ক) স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি তা দোহন করে উম্মে মা'বাদ এবং নিজ সঙ্গীদেরকে পান করালেন। সবশেষে তিনি নিজে তা পান করলেন। অতঃপর পরিপূর্ণ আর এক পাত্র দোহন করে তা উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। উম্মে মা'বাদ মহানবী ﷺ-এর বর্কত ও মু'জেযা দেখে বড় আশ্চর্যান্বিতা হলেন।

আবূ বুরাইদাহ আসলামীর কাহিনী

পথিমধ্যেই আবূ বুরাইদার সঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। ইনি স্বগোত্রের একদল লোক সহ (পুরস্কার লাভের লোভে) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খোঁজে বের হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে সরাসরি মুখোমুখী হয়ে কথা বললেন, তখনই তিনি সেই স্থানেই তাঁর স্বগোত্রের ৭০ জন লোক সহ ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর এটি ছিল মদীনা পৌঁছনোর আগে ইসলামী দাওয়াতের সদ্য বিজয়।

কুবায় অবতরণ

১ম হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসের ৮ম তারীখে আল্লাহর রসূল ﷺ কুবায় অবতরণ করেন। এই সময় তাঁর সহিত সাক্ষাতে আগ্রহী মুসলিমগণ তকবীর বলে বলে তাঁকে খোশ-আমদেদ জানালেন। আসলে তখন মদীনার সকল স্থান খোশ-আমদেদ জানানোর পরিবেশে আনন্দ-মুখর। সে দিনটি ছিল নযীরবিহীন দৃশ্যময় দিন।

আল্লাহর রসূল ﷺ কুবায় ৪ দিন অবস্থান করেন; সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার। এরই মধ্যে তিনি মাসজিদে কুবা নির্মাণ করেন এবং তাতে নামাযও আদায় করেন। আর এটাই হল ইসলামের প্রথম মসজিদ, যা তাকওয়ার ভিত্তিতে কুবায় প্রতিষ্ঠালাভ করে।

মহানবী ﷺ মদীনায়

জুমআর দিন মহানবী ﷺ মদীনার পথে বের হলেন। পথিমধ্যে বনু সালেম বিন আওফ নামক গোত্রের বসতিস্থানে জুমআর সময় হয়ে গেল। তিনি (১০০ জন) মুসলিমদেরকে নিয়ে সেখানে ওয়াদীর (উপত্যকার) মাঝে জুমআর নামায আদায় করলেন; যেখানে বর্তমানেও মসজিদ রয়েছে। জুমআর পর মহানবী ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন। এ দিনটি ছিল একটি গৌরবময় সমুজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন। যেদিনে পরম খুশীর ঢলের সাথে আনন্দাশ্রুর মিলন ঘটেছিল। মদীনার গলিতে-গলিতে গুঞ্জরিত হয়েছিল তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদের শব্দ। মদীনার আনসারদের

শিশুকন্যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে স্বাগত জানিয়েছিল এই গীত গেয়েঃ

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

অর্থাৎ, বিদায়ী পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের উপর পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়েছে।

আহবানকারীরা যতক্ষণ আল্লাহকে আহবান করতে থাকবে ততক্ষণ আমাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজেব।

হে আমাদের মাঝে প্রেরিত (নবী)! আপনি তো অনুসরণীয় বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন।

হিজরী 1ম সাল থেকে 9ম সাল পর্যন্ত

❁❁❁❁❁❁

মসজিদে নববী নির্মাণ

মহানবী ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন। (প্রত্যেক মুসলিমই মনে মনে চাচ্ছিলেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর বাড়ির মেহমান হন।) তিনি তাঁর উটনীর লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। (আল্লাহর ইঙ্গিতে উটনী যেখানে গিয়ে থামবে, তিনি সেখানেই নামবেন।) চলতে চলতে উটনী এসে থামল (আবূ আইয়ুব আনসারীর বাড়ির সামনে)

মসজিদে নববীর স্থানে। উঁটনী বসে গেল। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। সেই জায়গাটি তখন মুআয বিন আফরার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত দুই এতীম ছেলের উঁট-ভেঁড়া-ছাগল বেঁধে রাখার আস্তাবল ছিল। মহানবী ﷺ তাদের নিকট থেকে জায়গাটি ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য (ওয়াক্ফ) করে দিলেন। তিনি আবূ আইয়ুব আনসারী (খালেদ বিন যায়দ ﷺ)এর বাড়ির মেহমান হলেন। এখানে থেকে তিনি মসজিদ ও নিজের বাসা বানালেন। অতঃপর তিনি নিজের বাসাতে গিয়েই বাস করতে লাগলেন।

ওদিকে আলী বিন আবী তালেব ﷺ মক্কায় থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে লোকেদের রাখা গচ্ছিত ধন সকলকে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর হিজরত করে মদীনায় (কুবাতে) মহানবী ﷺ-এর সাথে মিলিত হলেন।

ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন

হিজরী প্রথম সনেই আল্লাহর রসূল ﷺ মুহাজেরীন ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। ইসলামের শুরুতে এই বন্ধন-সূত্রেই একে অন্যের ওয়ারেস হতেন। (এই সময় আনসারগণ নিজেদের মাল-সম্পদ মুহাজেরীন ভাইদের জন্য কুরবানী দিয়েছেন। এমনকি যাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল তিনি একটিকে তালাক দিয়ে মুহাজের ভায়ের সাথে বিবাহও দিয়েছেন।)

এই অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন কায়েমের পাশাপাশি আল্লাহর রসূল ﷺ একটি ইসলামী অঙ্গীকার-নামাও লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত চুক্তিনামার

দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১। অন্যান্য লোক ছাড়া মুসলিমগণ একই উম্মত।

২। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর বিপক্ষে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ; যদিও সে বিদ্রোহী তাঁদেরই কেউ হয়।

৩। কোন মুমিন কোন মুমিনের বিরুদ্ধে কোন কাফেরকে সাহায্য করবেন না।

৪। কোন ফাসাদী (বিদআতী)কে সাহায্য করা অথবা তাকে আশ্রয় দেওয়া কোন মুমিনের জন্য বৈধ হবে না।

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ মদীনার ইয়াহুদীদের সাথেও সন্ধি স্থাপন করলেন। সেই সময় তাদের বানু কাইনুকা', বানু নাযীর ও বানু কুরাইযাহ নামে তিনটি গোত্র ছিল। এদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট সকলে কাফের থেকে যায়।

মহানবী ﷺ-এর যুদ্ধ-জীবন

মদীনায় বসবাসকালে মুসলিমদের প্রভাব ও শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করল। (এদিকে কুরাইশদের সাথে ইয়াহুদীদের মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিমদের ঘরে ও বাইরে বিপদ ঘিরে ছিল।) এই সময় মহান আল্লাহ (মুসলিমদেরকে জিহাদে অনুমতি দেন; বরং) তাঁদের উপর জিহাদ ফরয ঘোষণা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য যুদ্ধ ফরয করা হল। যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাঁর জীবনে ২৮টি যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে ৯টি যুদ্ধে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। সেগুলি হল যথাক্রমে, বদর, উহুদ, মুরাইসী', খন্দক, কুরাইযাহ, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ।

এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাঁর কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আলোচনা করব।

1। (বড়) বদর যুদ্ধ

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সন ২য় হিজরীর ১৭ই রমযান শুক্রবারে বদর নামক স্থানে। এতে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল (৩১৩ বা) ৩১৪ জন এবং মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তার ৩ গুণ। এই যুদ্ধে মহান আল্লাহ ইসলামের বিজয় দান করেন ও মুসলিমদেরকে সম্মান-সমৃদ্ধ করেন এবং কুফর ও কাফেরদের মাথা চূর্ণ করে দেন। এখানে

৭০ জন (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সহ অন্যান্য) মুশরিক খুন হয় এবং ৭০ জন বন্দীরূপে আনীত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিমদের শহীদ হন ১৪ জন।

2। উহুদ যুদ্ধ

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সন ৩য় হিজরীর শওয়াল মাসে (মদীনা থেকে ৩ মাইল উত্তরে উহুদ পর্বতের পাদদেশে)। এ যুদ্ধে মহানবী ﷺ সরাসরি সশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

এতে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তার মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক ৩০০ জনকে নিয়ে কেটে পড়ে। আর (মক্কা থেকে আগত শত্রুদল) মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

উহুদের দিন ছিল মুসলিমদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার দিন। (যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর বিজয় পরিলক্ষিত হলেও পরিশেষে তীরন্দাজ বাহিনীর নববী নির্দেশ লংঘন করার ফলে পিছন থেকে কাফেররা পাল্টা আক্রমণ চালালে) মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। ফলে শত্রু আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আঘাতে তাঁর নিচের চোয়ালের ডান দিকের (ঠিক মাঝের পার্শ্ববর্তী) দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর কপাল বিক্ষত হয়। চোট লাগে তাঁর চেহারায়। (গালের উপরি অংশে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে যায়।)। তা দাঁত দিয়ে তুলতে গিয়ে আবূ উবাইদা ؓ-এর মাঝের দাঁত দুটি ভেঙ্গে যায়।

মুসলিম বাহিনীর ৭০ জন লোক শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে

আল্লাহর সিংহ (মহানবী ﷺ-এর চাচা) হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ؓ অন্যতম। শত্রুপক্ষ তাঁর কলিজা চিবিয়ে রাগ মিটায়। আর মুশরিকদের দলে নিহত হয় মাত্র ২৪ জন।

3। আহযাব, খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় সন ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে। আহযাব মানে দলসমূহ। এই দলগুলি ছিল কুরাইশ, গাত্বফান ও ইয়াহুদ। উক্ত তিনটি দল মিলে মুসলিমদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নির্মূল করে দেওয়ার ইচ্ছায় মদীনা অবরোধ করে যুদ্ধ করার মনঃস্থ করল। তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। আর মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। সালমান ফারেসী ؓ মদীনার উন্মুক্ত দিকটায় পরিখা (গর্ত) খননের পরামর্শ দিলেন; যাতে কাফেররা তা অতিক্রম করে মদীনার ভিতরে না আসতে পারে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর রসূল ﷺ পরিখা খনন করার আদেশ দেন। তিনি নিজেও তা খনন করায় মুসলিমদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। পরিখার ভিতরে (মদীনায়) মুসলিমরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত করলেন। ইতিমধ্যে নুআইম বিন মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি কূট কৌশলের মাধ্যমে কাফেরদেরকে পরাভূত এবং তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেন। এরপর মহান আল্লাহ তাদের জন্য ঝড় প্রেরণ করেন। (তাতে তাদের তাঁবু, পাত্র ও যুদ্ধের সামগ্রী বিধ্বস্ত হয়ে যায়।) ফলে তারা পরাজয় স্বীকার করে নিজ নিজ শহরে ফিরতে বাধ্য হয়।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ছয় জন আনসারী প্রাণ হারান এবং

মুশরিকদের পক্ষে দশ জন মারা যায়।

4। বানী কুরাইযার যুদ্ধ

চুক্তি ভঙ্গ করে বানী কুরাইযার ইয়াহুদীরা যেহেতু মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়ে খন্দকের যুদ্ধে শামিল হয়েছিল, তাই আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে শায়েস্তা করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। সুতরাং খন্দকের যুদ্ধ-ময়দান থেকে ফিরার পরই (জিবরীল عليه السلام-এর ইঙ্গিত মতে) তাদের দিকে ধাবিত হলেন। তাদের বসতিস্থলে পৌঁছে ২৫ দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখলেন। এর ফলে তাদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে তারা (স্বীয় মিত্র গোষ্ঠী আওসের নেতা) সা'দ বিন মুআযের বিচারে রাযী হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করল। তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী এবং ধন-সম্পদকে বন্টন করার ফায়সালা দিলেন। সুতরাং তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হল। আর তাদের সংখ্যা ছিল ৬০০ থেকে ৭০০ জন মত। তাদের ধন-সম্পদ ও মহিলাদেরকে মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হল।

5। বানুল মুস্তালিক বা মুরাইসী'র যুদ্ধ

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় সন ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে। (মুসলিমদের বিরুদ্ধে বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর শুনে) মহানবী ﷺ তাদের মুরাইসী' নামক এক ঝরনার উপর হামলা

চালান। তাদের অনেকে খুন হয়ে যায় এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়।

আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলঙ্কের কাহিনী

উক্ত যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে মা আয়েশার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক রটায় মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গীরা। এই রটনাতে কিছু মুসলিমও বিশ্বাস করে বসেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাত আসমানের উপর থেকে তাঁর পবিত্রতা (বর্ণনা করে সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত) অবতীর্ণ হয়।

6। হুদাইবিয়ার সন্ধি

এ যুদ্ধ ছিল সন ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর ১৫০০ সাহাবী সহ উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এ খবর পেয়ে মুশরিকরা তাঁদেরকে কা'বায় পৌঁছতে বাধা প্রদান করল। মহানবী ﷺ হুদাইবিয়াহ পর্যন্ত পৌঁছে মুশরিকদের সাথে দূত ও পত্র বিনিময় করলেন। পরিশেষে সুহাইল বিন আম্র এসে এই সন্ধিচুক্তি করল যে, তাঁরা এ বছরে উমরাহ না করে ফিরে যাবেন এবং আগামী বছরে তা আদায় করবেন। মহানবী ﷺ এ চুক্তি মেনে নিলেন। কিন্তু সাহাবাদের একটি জামাআত এ চুক্তিকে অপছন্দ করলেন; যদিও সেটা ছিল বিজয় লাভের সূত্রপাত।

অতঃপর পরবর্তী বছরে ৭ম হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে

হুদাইবিয়াহ থেকেই উক্ত উমরাহ কাযা করলেন। সুতরাং তিনি উমরার (ইহরাম বাঁধা অবস্থায়) মক্কা প্রবেশ করলেন।

7। খাইবার যুদ্ধ

৭ম হিজরীর মুহার্রাম মাসে মহানবী ﷺ ওয়াদিউল কুরা অবরোধ করেন। এই সময় মহান আল্লাহ তাঁর হাতে বহু ইয়াহুদী কেল্লা জয় করান। কেল্লার সম্পদ গনীমতরূপে লাভ করেন। এরপর অন্যান্য কেল্লার ইয়াহুদীরাও আত্মসমর্পণ করে।

ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা

এই যুদ্ধে যায়নাব বিন্তুল হারেষ নামক এক ইয়াহুদী মহিলা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে (দাওয়াত করে) বিষ-মিশ্রিত (পাকানো) ছাগল (খেতে) হাদিয়া দেয়। বিশ্র বিন বারা' সেই গোশ্ত খেয়ে প্রাণ হারান। মহানবী ﷺ সামান্য গ্রহণ করে তা উগলে ফেলেন এবং সকলকে সতর্ক করে দেন যে, এতে বিষ মিশানো আছে। বিশ্রের খুনের বদলাস্বরূপ ঐ মহিলাকে হত্যা করেন।

8। মক্কা বিজয়-যুদ্ধ

মক্কা-বিজয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর ২০শে রমযান। এ যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ও কুরাইশদের মাঝে যে (হুদাইবিয়ার) চুক্তি ছিল তা তারা ভঙ্গ করে।

এর ফলে মহানবী ﷺ দশ হাজার সাহাবী নিয়ে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মক্কার দিকে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে তিনি যাহরান নামক উপত্যকার কাছে অবস্থিত জনপদে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁর চাচা আব্বাস আবূ সুফিয়ানকে সঙ্গে করে আনলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ নিরাপদে বিনা যুদ্ধে মক্কায় প্রবেশ করেন।

9। হুনাইনের যুদ্ধ

শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধ হয়েছিল ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে। এতে মহান আল্লাহ ষাক্বীফ ও হাওয়াযেন উভয় গোত্রের উপর মুসলিমদেরকে বিজয়ী করেন। হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলিমদেরকে দেখে পালাতে শুরু করলে, মুসলিমরা তাদের পশ্চাতে ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করেন। মহানবী ﷺ তাদের ধন-সম্পদ ও শিশু-মহিলাদের অধিকারী হয়ে যান। আর তাদের মধ্যে হত্যা করা হয় অনেককে।

10। তায়েফের যুদ্ধ

হুনাইন থেকে ফিরার পথে তায়েফের যুদ্ধ হয়। সেখানে দুর্গে আশ্রয়গ্রহণকারী ষাকীফ ও হাওয়াযেনের অবশিষ্ট মুশরিকদের অবরোধ করেন। কিন্তু তারা বশ্যতা স্বীকার করল না। বরং দুর্গের ভিতর তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হল। ফলে মহানবী

ﷺ তাদের খুব বড় ক্ষতি সাধন করতে পারলেন না। বলা বাহুল্য, তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং (মক্কায় ফিরার পথে) জিইর্রানায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে হাওয়াযেন গোত্রের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। সেই দলের দলপতি ছিলেন মালেক বিন আওফ। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁদের যুদ্ধবন্দী পরিবারকে ফেরৎ দিলেন। মালেক বিন আওফকে তাঁর আমীরী পদে বহাল রাখলেন। পরবর্তীতেও তিনি একজন আদর্শ মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অতঃপর ১৭ই যুল-ক্বাদাহ মহানবী ﷺ জিইর্রানাহ থেকে উমরাহ আদায় করেন। উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

11। তাবূক যুদ্ধ

এ যুদ্ধ হয়েছিল ৯ম হিজরীর রজব মাসে। এই সংকটময় যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল উষমান বিন আফ্ফান ﷛-এর অঢেল বদান্যতায়। (মুসলিমদের জন্য হুমকিস্বরূপ মহাশত্রু) রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য সহ তাবূকের দিকে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে প্রায় ৮০ জন মুনাফিক এবং ৩ জন মুমিন অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ মুমিনদের তওবা কবুল করেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ তাবূকে পৌঁছে (সন্ধি করে) বিনা যুদ্ধে মদীনায় ফিরে আসেন। (প্রায় পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর) ৯ম

হিজরীর রমযান মাসে মদীনায় পৌঁছেন।

মুনাফিকরা মুসলিমদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য 'যিরার' মসজিদ নির্মাণ করেছিল। এই সময় মহানবী ﷺ তা ভেঙ্গে ফেলেন।

যে সব অভিযানে মহানবী ﷺ অংশগ্রহণ করেন নি

এমন কিছু যুদ্ধ-অভিযান ছিল, যাতে মহানবী ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেন নি; বরং তাতে সাহাবাগণকে প্রেরণ করেছেন - তাতে সংঘর্ষ হোক অথবা না হোক। এমন অভিযান-বাহিনীকে আরবীতে 'বুউষ বা সারায়া' বলে। মহানবী ﷺ এমন অভিযান-বাহিনী প্রেরণ করেছেন ৫৬টি। অবশ্য 'সারিয়্যাহ' হল শত্রুর মোকাবিলায় প্রেরিত উর্ধ্বপক্ষে ৪০০ জন শ্রেষ্ঠ সৈনিক নিয়ে গঠিত একটি দল। আর 'বা'ষ' বলে 'সারিয়্যাহ' থেকে ভাগ হয়ে যাওয়া দলকে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রেরিত সর্বপ্রথম 'বা'ষ' ছিল তাঁর চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের ৩০ জন সৈনিক নিয়ে গঠিত একটি মুহাজেরীনদের দল, যা 'সাইফুল বাহর'-এ প্রেরিত হয়েছিল। সেখানে উক্ত দল আবূ জাহল বিন হিশাম ও তার ৩০০ জন সঙ্গীর মুখোমুখী হয়। তবে উভয় দলের মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়নি।

এই শ্রেণীর সর্বশেষ যোদ্ধাদল হল শাম দেশের উদ্দেশ্যে প্রেরিত উসামাহ বিন যায়দ বিন হারেষার 'বা'ষ'। মহানবী ﷺ উসামাকে

আদেশ দেন যে, ফিলিস্তীনের বালকা' ও দারূম (গাযযার পরে অবস্থিত দুর্গ) যেন তাঁর অশ্ববাহিনী দ্বারা পদদলিত হয়। (যার ফলে রোমকদের মনে মুসলিমদের প্রতি ত্রাস সৃষ্টি হয়।) কিন্তু উক্ত বাহিনী মদীনা থেকে মাত্র ৩ মাইল দূরে জুর্ফ্ নামক স্থানে পৌঁছেই মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের খবর শোনে।

বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের বর্ষ

হিজরীর ৯ম বর্ষে মহানবী ﷺ আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ-কে সে বছরের হজ্জের আমীর বানিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন। আর তাঁর সঙ্গে আলী ؓ-কে সূরা বারাআত (তাওবাহ) সহ এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, "এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন কা'বা-গৃহের হজ্জ না করে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন তার তওয়াফ না করে।"

এই বছরেই ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে বহু প্রতিনিধি দল আসতে থাকে এবং দলে দলে বহু মানুষ সত্য দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে। এই কথার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সূরা নাসরে;

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ۝٣ ﴾

অর্থাৎ, যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। তুমি দেখবে মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।

এই বছরেই আল্লাহর রসূল ﷺ মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে আবূ মূসা আশআরী ﷺ-এর সাথে (মুবাল্লিগরূপে) ইয়ামান প্রেরণ করেন। পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠিসহ দূত প্রেরণ করেন। ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। দ্বীনের কালেমাহ সমুচ্চ হয়। সত্য আগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়। আর অবশ্যই মিথ্যা বিলীয়মান।

বিদায়ী হজ্জ

হিজরীর ১০ম বর্ষে মহানবী ﷺ হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা বের হন। যুল-ক্বা'দাহ মাসের ৬ (৫ বা ৪) দিন বাকী থাকতে বৃহস্পতিবার মদীনায় যোহরের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদল সহ বের হয়ে যুল-হুলাইফায় আসরের নামায পড়েন ২ রাকআত। অতঃপর সেখানেই রাত্রিযাপন করেন। এখান থেকে তিনি একই সাথে হজ্জ ও উমরার (ক্বিরান হজ্জের) ইহরাম বাঁধেন এবং ইহরাম অবস্থায় তিনি ৪ঠা যুল-হজ্জ (রবিবার) মক্কায় প্রবেশ করেন। লোকেরা ছিল তাঁর সম্মুখে-পশ্চাতে, ডানে ও বামে। সকলেই চায় তাঁর অনুসরণ করে হজ্জ পালন করতে।

(এই হজ্জে তিনি ঐতিহাসিক বিদায়ী ভাষণ দান করেন।) হজ্জের কাজ সমাধা করে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আদর্শ জীবনের অবসান

শেষ হজ্জ করে মদীনায় ফিরে মহানবী ﷺ যুল-হজ্জের বাকী কয়েক দিন, মুহার্রাম ও সফর মাস (সুস্থ অবস্থায়) অতিবাহিত করেন। অতঃপর (২৯শে সফর) তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার সূচনা হয় মাথা ব্যথা দিয়ে। বৃহস্পতিবার (অথবা সোমবার) উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রাঃ)এর বাসায় তাঁর ব্যথা শুরু হয়। মা আয়েশা (রাঃ)এর বাসায় তাঁর শুশ্রূষা নেওয়ার আশায় তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট থেকে অনুমতি চেয়ে নেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে অনুমতি দান করেন। এই ব্যথা তাঁর মাথায় ১২ অথবা ১৪ দিন অব্যাহত থাকে। এই অবস্থায় তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-কে নামাযে ইমামতি করার আদেশ প্রদান করেন। আবূ বাক্র এই সময় ১৭ অক্তের নামায পড়ান। এক অক্তের নামায তিনি আবূ বাকরের পাশে বসে বসে ইমাম হয়ে আদায় করেন।

ইন্তিকালের একদিন পূর্বে তিনি তাঁর দাসদেরকে মুক্তি দান করেন। স্বর্ণমুদ্রা যা ছিল সব সাদকাহ করে দেন। অস্ত্রগুলো মুসলিমদেরকে দান করেন। মীরাস বলতে তিনি কিছুই বাকী রাখলেন না।

ইন্তিকালের দিন কন্যা ফাতিমাকে কানে কানে তাঁর বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার কথা জানালে তিনি কেঁদে উঠলেন। অতঃপর তাঁকে অতি সত্বর তাঁর সাথে মিলিত এবং তিনি জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী হওয়ার কথা জানানো হলে তিনি হাসলেন।

হাসান-হুসাইনকে কাছে ডেকে আদর করে চুম্বন দিলেন। স্ত্রীগণকে ডেকে সকলকে নসীহত করলেন।

রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। খায়বারের বিষ খাওয়ার প্রতিক্রিয়াও শুরু হল। তিনি উম্মতকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বারবার বললেন, “নামায, নামায। আর তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীগণ (ব্যাপারে সতর্ক হও)।

এক সময় তিনি মিসওয়াক দেখে মিসওয়াক করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা আয়েশা মিসওয়াক নিয়ে চিবিয়ে নরম করে দিলে তিনি মিসওয়াক করলেন।

মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে তিনি পাশে রাখা পাত্রের পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে নিজ মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা।”

সবশেষে তিনি হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং উপর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখলেন। এ সময় তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। এ সময় তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দীক, শহীদগণ এবং সৎব্যক্তিগণ; যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ তুমি আমাকে তাঁদের দলভুক্ত কর। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি তুমি দয়া কর। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত কর।”

অতঃপর শেষ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে তাঁর হাত অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। পরিশেষে হিজরী সনের ১১ বর্ষের রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারীখ, মোতাবেক ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের ৭ তারীখে সোমবার তাঁর আদর্শ জীবনের চির অবসান ঘটে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর (৪ দিন)। নবুঅতের পূর্বে ৪০ বছর, নবী ও রসূল অবস্থায় ২৩ বছর; এর মধ্যে ১৩ বছর

মক্কায় এবং ১০ বছর মদীনায় কালাতিপাত করেন। ইন্তিকাল করেন মদীনায় স্ত্রী আয়েশার বুকে মাথা রেখে।

এদিকে তাঁর পরলোক গমনের খবর সাহাবাগণ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উমার ﷺ বলেছিলেন, 'আল্লাহর রসূল অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং যে মনে করে যে, তিনি মারা গেছেন, তিনি তার হাত-পা কেটে ফেলবেন!'

আর তরবারি তুলে বলেছিলেন, 'যে বলবে যে, তিনি মারা গেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

কিন্তু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক মহানবী ﷺ-এর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুম্বন দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাইরে এসে কুরআন মাজীদের আয়াত পাঠ দ্বারা তাঁর ইন্তিকালের কথা প্রমাণ করে উমার ﷺ-কে প্রকৃতস্থ করলেন। মদীনায় নেমে এল সীমাহীন শোকের ঘন অন্ধকার।

মঙ্গলবার মহানবী ﷺ-কে তাঁর কাপড়সহ গোসল দেওয়া হল। তাঁকে গোসল দিতে অংশগ্রহণ করলেন, আব্বাস, আলী, আব্বাসের দুই ছেলে ফায্‌ল ও কুষাম, মহানবী ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস শাকরান, উসামাহ বিন যায়দ ও আওস বিন খাওলী ﷺ।

গোসলের পর তিনটি ইয়ামানী চাদর দিয়ে তাঁকে কাফনানো হল। মতভেদের পর তাঁর মৃত্যুস্থলে মা আয়েশা (রাঃ)এর হুজরায় বগলী কবর খনন করা হল। সাহাবাগণ দলে দলে ঘরে প্রবেশ করে এক এক করে তাঁর জানাযা পড়লেন। জানাযা পড়লেন মহিলা ও শিশুরাও। মঙ্গলবার সারা দিন জানাযা চলল। পরিশেষে বুধবার

রাতের মধ্যভাগে তাঁর দেহ সমাহিত করা হল।

লক্ষ লক্ষ উম্মতকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে প্রিয়নবী ﷺ চির দিনের জন্য ইহকাল হতে বিদায় নিয়ে মহান বন্ধুর কাছে পৌঁছে গেলেন।

মহানবী ﷺ-এর পরিবারবর্গ

(প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা বেঁচে থাকা অবধি তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি।) তাঁর ইন্তিকালের পর (নানা হিকমত ও যৌক্তিকতার খাতিরে) একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। চরিতবিদ্ ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি সর্বমোট ১৩ জন স্ত্রী গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ১১ জনের সাথে তাঁর ঘর-সংসার হয়। আর এতে কোন দ্বিমত নেই যে, ইন্তিকালের সময় তাঁর ৯ জন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। তাঁরা হলেন, (১) (আবূ বাক্র সিদ্দীকের কন্যা) আয়েশা (২) (উমার ফারূকের কন্যা) হাফসাহ (৩) (আবূ সুফিয়ানের কন্যা) উম্মে হাবীবাহ (রামলাহ) (৪) উম্মে সালামাহ (হিন্দ) (৫) মাইমূনাহ (৬) সাওদাহ (৭) যায়নাব (বিন্তে জাহশ) (৮) জুয়াইরিয়্যাহ ও (৯) সাফিয়্যাহ।

যায়নাব বিন্তে খুযাইমাহও তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গে কেবল ৮ মাস সংসার করে পূর্বেই মারা যান।

এ ছাড়া তাঁর সন্তান ইবরাহীমের মাতা মারিয়াহ কিবতিয়াহ (অধিকারভুক্ত দাসী) এবং রায়হানা (অনুরূপ অধিকারভুক্ত দাসী) তাঁর সাহচর্য ও দাম্পত্য লাভ করেছিলেন। (রাযিয়াল্লাহু তাআলা

আনহুন্ন)

উম্মুল মুমিনীনদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

❁❁❁❁❁❁❁

(1) খাদীজা (রাঃ)

খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রাঃ) ছিলেন মহানবীর প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম। তিনিই স্বামীকে ইসলামে প্রথম সহযোগিতা করেন। মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর আব্বা; মতান্তরে তাঁর ভাই আম্র বিন খুওয়াইলিদ। তিনি মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই নবুঅতের ১০ম বর্ষে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে মহানবী ﷺ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি।

(2) সাওদাহ (রাঃ)

সাওদাহ বিন্তে যামআহ (রাঃ) মহানবী ﷺ-এর বিবাহ-বন্ধনে আসেন হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে। ইনি ছিলেন একজন বিধবা ইনি উমার ﷺ-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন।

(3) আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা বিন্তে আবূ বাকর সিদ্দীক মহানবী ﷺ-এর বিবাহ-বন্ধনে আসেন হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে; (নবুঅতের একাদশ বর্ষে)

সাওদাহ (রাঃ)এর বিবাহের ১ বছর পরে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৬ বছর। তাঁর পিতা আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ তাঁর বিবাহ দেন। সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে কেবল তিনিই ছিলেন একমাত্র কুমারী। হিজরতের ৭ মাস পরে শওয়াল মাসে তাঁদের বাসর হয়। তখন তাঁর বয়স ৯ বছর। আর যখন তাঁর বয়স ১৮ বছর, তখন মহানবী ﷺ ইন্তিকাল করেন। হিজরী ৫৮ সনে মুআবিয়ার খিলাফতকালে ৬৭ বছর বয়সে মদীনায় তিনি ইন্তিকাল করেন। বাকী' গোরস্থানে তাঁর দাফন হয়। তাঁর জানাযা পড়েন আবূ হুরাইরা ﷺ।

(4) হাফসাহ (রাঃ)

হাফসাহর বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর পিতা উমার ফারূক ৩য় হিজরীর শা'বান মাসে। তিনি একজন বিধবা মহিলা ছিলেন। বিবাহের পর আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে একবার তালাক দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নেন। সন ৪১ অথবা ৪৫ অথবা ৫০ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

(5) যায়নাব বিন্তে খুযাইমাহ (রাঃ)

৪র্থ হিজরীর রমযান মাসে মহানবী ﷺ তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনিও একজন বিধবা ছিলেন। গরীব-মিসকীনদের প্রতি তিনি ছিলেন বড় দয়ার্দ্র-হৃদয়। তাই তাঁর পদবী হয়েছিল

'উম্মুল মাসাকীন।' তিনি মহানবী ﷺ-এর সাথে মাত্র ৮ মাস সংসার করে পরলোক গমন করেন।

(6) উম্মে সালামাহ (রাঃ)

তাঁর নাম ছিল হিন্দ্‌ বিন্তে আবী উমাইয়্যাহ। ইনিও বিধবা ছিলেন। হিজরী ৪র্থ সালে (মতান্তরে ৩য় সালে) মহানবী ﷺ তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি ৫৯ হিজরী সনে; মতান্তরে ৬২ সনে ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন।

(7) যায়নাব বিন্তে জাহশ (রাঃ)

ইনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ফুফু উমাইমার কন্যা ছিলেন। প্রথমে তাঁর বিবাহ হয় যায়দ বিন হারেষার সঙ্গে; যাঁকে মহানবী ﷺ-এর (পোষ্য)পুত্র মনে করা হত। কিন্তু তাঁর সাথে বনিবনাও না হলে তিনি তাঁকে তালাক দেন। অতঃপর পোষ্যপুত্রের কুপ্রথা চিরদিনের মত দূর করার মানসে ৫ম হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে মহান আল্লাহ নিজে মহানবী ﷺ-এর সাথে যায়নাবের বিবাহ দেন।

বিবাহের পরদিন সকালে পর্দা ফরয হয়। মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই হিজরী ২০ সনে পরলোক গমন করেন। তাঁর জানাযা পড়েন উমার বিন খাত্তাব رضي الله عنه।

(8) জুয়াইরিয়্যাহ (রাঃ)

জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তুল হারেষ বানু মুস্তালিক যুদ্ধের যুদ্ধ-বন্দিনী ছিলেন। যুদ্ধের গনীমত বন্টনের সময় তিনি ষাবেত বিন কায়সের ভাগে পড়েন। ষাবেত তাঁর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীন করার চুক্তি করেন। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে সেই অর্থের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ছিলেন সর্দার-কন্যা। মহানবী ﷺ সেই অর্থ প্রদান করে তাঁকে ক্রয় করে স্বাধীন করার পর ৬ষ্ঠ হিজরীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি হিজরী ৫০ অথবা ৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

(9) উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)

উম্মে হাবীবাহ বিন্তে আবী সুফিয়ানের নাম ছিল রামলাহ। ইসলামের শুরুতে স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে স্বামী ধর্মত্যাগী হয়ে মারা যায়। মহানবী ﷺ তাঁকে ৬ অথবা ৭ম হিজরীতে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। তিনি মুআবিয়ার খিলাফতকালে ৪৪ হিজরী সনে ইহকাল ত্যাগ করেন।

(10) সাফিয়্যাহ (রাঃ)

সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই ছিলেন খায়বারের ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী কবি কিনানার স্ত্রী। ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধে যুদ্ধ-বন্দিনীরূপে তিনি

দেহইয়া কালবীর ভাগে পড়েন। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্তা ও সুন্দরী। সাহাবাগণের আশানুরূপ ৭টি দাসীর বিনিময়ে নিয়ে মহানবী ﷺ তাঁকে স্বাধীন করে বিবাহ করেন। স্বাধীনতাই তাঁর মোহর হয়। হিজরী ৩৬ হিজরীতে ; মতান্তরে মুআবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

(11) মাইমূনাহ (রাঃ)

হিজরী ৭ম সালের যুল-ক্বা'দাহ মাসে কাযা উমরাহ শেষ করার পর মহানবী ﷺ মাইমূনাহ বিন্তুল হারেষ আল-হিলালিয়্যাহ (রাঃ)কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ইনি ছিলেন ইবনে আব্বাস ও খালেদ বিন অলীদের খালা। ইনি বিধবা ছিলেন। আব্বাস ؓ-এর তত্ত্বাবধানে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

হিজরী ৩৮; মতান্তরে ৪০ সালে মক্কার নিকটবর্তী সারিফে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

অন্যান্য স্ত্রীগণ

মহানবী ﷺ যে মহিলাদেরকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সহিত বাসর হয় নি - চরিতকার ইবনে ইসহাকের মতে - তাঁরা হলেন দুই জন; আসমা বিন্তে নু'মান আল-কিন্দিয়াহ এবং

আমরাহ বিন্তে ইয়াযীদ (বা যায়দ) আল-কিলাবিয়্যাহ। ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্যান্য চরিতকারগণ আরো একজন স্ত্রীর নাম উল্লেখ করে থাকেন, যাঁর সাথেও মহানবী ﷺ-এর বাসর হয় নি; বরং তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। তিনি হলেন আলিয়াহ বিন্তে যাবইয়ান।

এ ছাড়া তাঁর সন্তান ইবরাহীমের মাতা মারিয়াহ বিন্তে শামঊন কিবত্বিয়াহ অধিকারভুক্ত দাসী ছিলেন। মিসর ও ইস্কান্দারিয়ার রাজা মহানবী ﷺ-কে উপহার স্বরূপ তাঁকে প্রদান করেন। আর রায়হানা বিন্তে আম্‌রও অনুরূপ অধিকারভুক্ত দাসী ও বানু কুরাইযাহ গোত্রের যুদ্ধবন্দিনী ছিলেন। মহানবী ﷺ নিজের খিদমতের জন্য তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুন্ন)

মহানবী ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি

মহানবী ﷺ-এর সকল পুত্র-কন্যা খাদীজা (রাঃ)এর গর্ভে জন্ম নেন। কেবল ইবরাহীম ছিলেন মারিয়াহ কিবতিয়ার গর্ভে।

তাঁর পুত্র সন্তান ছিল ৪টি। (১) কাসেম; আর তাঁর নাম ধরেই মহানবী ﷺ-এর উপনাম ছিল আবুল কাসেম। তিনি অল্প কয়েক দিন মাত্র দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন। (২) তাহের (৩) ত্বাইয়িব ও (৪) ইবরাহীম।

ঐতিহাসিক ত্বাবারী আরো একজন পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন আব্দুল্লাহ। মতান্তরে তাহের ও ত্বাইয়িব হল আব্দুল্লাহরই উপাধি।

ইবরাহীমের জন্ম হয় মদীনায়। তিনি ২২ মাস জীবিত ছিলেন।

অতঃপর মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের মাত্র ৩ মাস আগে তিনি মারা যান। তাঁরই মৃত্যুর সময় মহানবী ﷺ-এর চোখে অশ্রু বিগলিত হয়।

তাঁর ছেলেরা সকলেই শিশু অবস্থায় মারা যান; কিন্তু মেয়েরা বড় হয়ে ঘর-সংসারও করেন। মেয়েদের মধ্যে বড় হলেন যায়নাব (রাঃ)। তাঁর বিবাহ হয় তাঁরই খালাতো ভাই আবুল আস বিন রাবী'র সাথে। তাঁর একটি কন্যাও জন্মে, তাঁর নাম ছিল উমামাহ। যায়নাব ৮ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন রুক্বাইয়াহ (রাঃ)। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় আবূ লাহাবের ছেলে উতবার সাথে। কিন্তু (সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর) আবূ লাহাবের আদেশে বাসরের পূর্বেই সে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর তাঁর পুনর্বিবাহ হয় উযমান বিন আফ্‌ফান ﷺ-এর সাথে। তাঁদের একটি পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। রুক্বাইয়াহ স্বামীর সাথে হাবশা ও পরে মদীনা হিজরত করেন। অতঃপর ২য় হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মহানবী ﷺ-এর তৃতীয় কন্যা ছিলেন উম্মে কুলষূম (রাঃ)। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় আবূ লাহাবের ছেলে উতাইবার সাথে। কিন্তু বাপের আদেশে বাসরের পূর্বেই সে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর রুক্বাইয়ার ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীতে উযমান (রাঃ)এর সাথে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। অতঃপর ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

মহানবী ﷺ-এর চতুর্থ কন্যা ছিলেন ফাতিমাহ (রাঃ)। তাঁর বিবাহ হয় আলী ﷺ-এর সাথে ২য় হিজরীতে। বদর যুদ্ধের পর তাঁদের বাসর হয়। তাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন হাসান, হুসাইন, যায়নাব ও উম্মে কুলষূম ﷺ। ফাতিমাহ মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের ১০০ দিন পর - মতান্তরে ১১ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম নওবী বলেন, মহানবী ﷺ-এর ৪ জন কন্যা সন্তান হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আর বিশুদ্ধ মতে তাঁর পুত্র সন্তান ছিল ৩ জন।
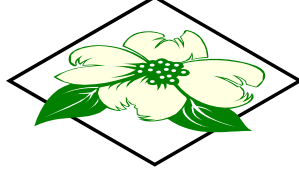
মহানবী ﷺ-এর নাম ও গুণাবলী

❁❁❁❁❁

তাঁর নামাবলী

জুবাইর বিন মুত্বইম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার একাধিক নাম আছে; আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহমাদ (অতি প্রশংসাকারী), ([1]) আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী); আল্লাহ আমার দ্বারা কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের (সমবেতকারী); আমার পশ্চাতে সকল লোককে সমবেত করা হবে। আর আমি আক্বেব (পশ্চাতে আগমনকারী); আমার পর কোন নবী নেই।" *(বুখারী + মুসলিম)*

আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের কাছে তাঁর নিজের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করতেন; তিনি বলতেন, "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি মুক্বাফ্ফী (সর্বশেষে আগমনকারী), আমি হাশের, নাবিইউত তাওবাহ (তাওবাকারী নবী) এবং নাবিইউর রাহমাহ (দয়াশীল, রহমতের নবী)।"
(মুসলিম)

মহানবী ﷺ-এর দেহশ্রী

([1]) প্রকাশ যে, এ নাম দুটি কুরআন মাজীদেও উল্লেখ হয়েছে।

মহানবী ﷺ-এর দেহ ছিল মাঝামাঝি গড়নের। তিনি না বেশী লম্বা ছিলেন, আর না খাট। তাঁর দেহের রঙ ছিল গৌর (দুধে-আলতায় গোলা) বর্ণের লাবণ্যময়। মাথার কেশ ছিল ঘন ও সুন্দর (অতিরিক্ত কোঁকড়ানো ছিল না)। কানের লতি পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। চুলের রঙও ছিল ঘন কালো। তাঁর কতক চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাতে তিনি (লালচে) কলফ ব্যবহার করেছেন। চক্ষু ছিল ডাগর ও সুর্মা বরন। ভ্রূ ছিল জোড়া ও চিকন। বুক ও পেট লোমে ঢাকা ছিল না। অবশ্য উভয়ের মধ্যভাগে (সরু ও লম্বা ভাবে হালকা) লোম ছিল। তাঁর চেহারা ছিল সবার চাইতে সুশ্রী। গোলাকার চাঁদ ও সূর্যের মত। মুখগহ্বর ছিল প্রশস্ত। দাড়ি ছিল ঘন। নাক ছিল সমুন্নত। তাঁর কাঁধ ছিল চওড়া। মাথা ছিল বড়। ঘাড় ছিল লম্বা। ললাট ছিল প্রশস্ত। হাত-পা ছিল ভারী ভারী। গোড়ালীতে মাংস ছিল হালকা। হাতের তেলো ছিল রেশম অপেক্ষা নরম। তাঁর দেহের ঘাম ছিল মুক্তার মত এবং সুগন্ধময়। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে পিঠে ছিল নবুঅতের মোহর। তিনি (বিশেষ করে নামাযে) সামনে যেমন দেখতেন, পিছনেও তেমন দেখতে পেতেন। রাতে মহান আল্লাহ তাঁকে পানাহার করাতেন। তিনি হাঁটার সময় সম্মুখ দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন।

মহানবী ﷺ যা ভালোবাসতেন

মহানবী ﷺ-এর চক্ষুশীতলকারী জিনিস ছিল নামায। আর পার্থিব

জিনিসের মধ্যে তিনি ভালোবাসতেন আতর ও স্ত্রী। তিনি সবার চাইতে বেশী ভালোবাসতেন আয়েশা (রাঃ)কে। আর পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন তাঁর পিতা আবূ বাক্‌রকে।

তিনি মিসওয়াক করতে ভালোবাসতেন। খাবারের মধ্যে মধু ও মিষ্টি জিনিস পছন্দ করতেন। গোশ্তের মধ্যে রানের গোশ্‌ত্ ভালোবাসতেন। সব্জির মধ্যে পছন্দ করতেন লাউ বা কদু।

রঙের মধ্যে সাদা রঙ বেশী পছন্দ করতেন। লেবাসের মধ্যে পছন্দ করতেন কামীস (কাঁধ হতে গোড়ালীর উপর পর্যন্ত লম্বা জামা)।

মহানবী ﷺ-এর মু'জেযাসমূহ

মহানবী ﷺ-এর সত্যতা ও নবুঅতের প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ তাঁর মাঝে কিছু অলৌকিক শক্তি, অতিপ্রাকৃত নিদর্শন ও অনৈসর্গিক কর্মকান্ড প্রকাশ করেছিলেন। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। কুরআন কারীম ঃ মহান আল্লাহ এই সাহিত্যগ্রন্থ দিয়ে আরবের সাহিত্যিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই অনুরূপ একটি সূরা বা আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয় নি। আর মহানবী ﷺ নিজে ছিলেন নিরক্ষর। কোন মানুষ তাঁর শিক্ষক ছিল না।

২। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া ঃ মহানবী ﷺ-এর আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল এবং কুরাইশ তা সচক্ষে দর্শনও করেছিল।

৩। নয় শত লোকের সৈন্যদলকে কতকগুলি খেজুর ভরপেট খাইয়েও পরিশেষে তা বেঁচে গিয়েছিল।

৪। মহানবী ﷺ-এর আঙ্গুলসমূহের মাঝ হতে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়েছিল। সেই পানি সেনাবাহিনীর সবাই পান করেছিলেন।

৫। শত্রুপক্ষের সৈন্যের উপর তিনি এক মুঠো ধুলো ছিটিয়ে দিলে সকলের চোখে তা পৌঁছে গিয়েছিল।

৬। যে খেজুরের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন, মিম্বর বানাবার পর তা ত্যাগ করলে উঁটের মত তার কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল।

৭। গাছের ডাল ধরে টান দিলে পর্দার জন্য গাছ তার সঙ্গে চলেছিল।

৮। (আল্লাহর তরফ থেকে) তিনি বহু গায়বী খবর এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা ঠিক ঠিক ভাবে ঘটেছে, ঘটছে ও ঘটবে।

যেমন, তিনি বলেছিলেন যে, আম্মারকে এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। তাই ঘটেছে। উষমান ﷺ-এর ফিতনার বিষয়ে যা বলেছিলেন, তাই ঘটেছে। হাসান বিন আলী ﷺ-এর হাতে মুসলিমদের বিরাট দুই দলের মাঝে শান্তি স্থাপন হওয়ার খবরও সত্য ঘটেছে। একজন মুজাহেদের জন্য বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ খবর নিয়ে দেখেন, সে আত্মহত্যা করে মারা যায় এবং তার ফলে সে জাহান্নামী হবে। ইসরা’ ও মি’রাজ ভ্রমণের পরে মুশরিকরা তা মিথ্যা মনে করে সত্যতার প্রমাণ চেয়ে তাঁকে

বায়তুল মাক্বদেসের নকশা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি মক্কা থেকেই তার ছবি দেখে পূর্ণরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পূর্বেই কোরাইশদলের কার কোথায় বধ্যভূমি হবে তার নাম ও স্থান চিহ্নিত করেছিলেন। *(মিঃ ৫৮৭১ নং)* খয়বরের এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁকে আমন্ত্রিত করে বিষ-মিশ্রিত মাংস খেতে দিয়েছিল, তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। *(মিঃ ৫৯৩১ নং)* মুসলিমদের গুপ্ত রহস্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্বলিত এক গোপন পত্র সহ এক মহিলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাচ্ছিল, তার খবর জানিয়ে সাহাবা পাঠিয়ে তা প্রতিহত করেছিলেন। মুতা অভিযানে হযরত জা'ফর ও যায়দের (রাঃ) শহীদ হওয়ার সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ ফিরে আসার পূর্বেই মদীনায় অবস্থান করেই সকলকে জানিয়েছিলেন। *(বুঃ ৩৬৩০ নং)* তাঁর ইন্তিকালের পর আহলে বায়তের মধ্যে হযরত ফাতিমার (রাঃ) প্রথম মৃত্যু হবে তা জানিয়েছিলেন। ইত্যকার বহু বিষয়ের ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর তিনি (অহীর মাধ্যমে) জেনেছিলেন ও জানিয়েছিলেন।

৯। মহানবী ﷺ-এর সম্মুখস্থ খাবারের তসবীহ শোনা গেছে।

১০। তাঁর সত্যতার সাক্ষি দিতে হস্তমুষ্টিতে কঙ্কর তসবীহ পড়েছিল।

১১। তিনি ইসরা' ও মি'রাজ ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

১২। খায়বারের দিন আলী ؓ-এর নেত্রদাহে তাঁর চোখে মহানবী ﷺ থুথু লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে ভালো হয়ে গিয়েছিল

এবং তারপর আর কোন দিন তাঁর ঐ রোগ দেখা দেয় নি।

এ ছাড়া আরো বহু মু'জেযা ছিল তাঁর; যা উল্লেখ করতে হলে বড় আকারের কয়েক খন্ডের গ্রন্থ রচনা করতে হবে।

মহানবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য

মহানবী আমাদের মত মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর মত অবশ্যই নই। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁর কিছু গুণ ছিল অতিরিক্ত, কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র। কিছু কর্ম ছিল তাঁর জন্য বৈধ; কিন্তু উম্মতের জন্য অবৈধ এবং অন্য কিছু কর্ম ছিল; যা তাঁর জন্য অবৈধ এবং উম্মতের জন্য বৈধ। এই শ্রেণীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ-

১। মহানবী ﷺ-এর জন্য চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ হালাল করা হয়েছিল। যেহেতু তাঁর কাছে যুলমের লেশমাত্র ছিল না।

২। তাঁর বিবাহ বিনা সাক্ষীতেই সম্পন্ন হত।

৩। তাঁকে যে গালি দিত অথবা তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করে নিন্দা করত, তাকে হত্যা করা তাঁর জন্য হালাল ছিল।

৪। তাঁর জন্য 'সওমে বিসাল' (মাঝে ইফতারী না করে এবং সেহরীও না খেয়ে একটানা দুই অথবা ততোধিক দিন রোযা রাখা) বৈধ ছিল।

৫। তিনি ঘুমিয়ে উঠে ওযূ না করে নামায পড়তেন। কারণ, ঘুমেও তিনি সুরক্ষিত হতেন। (তাঁর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হত; কিন্তু হৃদয় সজাগ থাকত।)

৬। তাঁর জন্য তাহাজ্জুদের নামায ছিল ওয়াজেব।

৭। শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

৮। তাঁর ব্যবহৃত ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন (মলমূত্র ও রক্ত ছাড়া) সকল জিনিস ছিল বর্কতময় মহৌষধ।

৯। তাঁর পূর্বাপর ত্রুটি মার্জনা করা হয়েছিল।

১০। তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজেব ছিল; যদিও আহূত ব্যক্তি নামাযরত থাকত।

১১। তাঁর তালাক দেওয়া বা ইন্তিকাল করার পর তাঁর সমস্ত স্ত্রীকে অপরের জন্য বিবাহ করা হারাম ছিল।

১২। ফিরিশ্তা তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বে বা পরে কারো সাথে করেন নি।

১৩। মহান আল্লাহ তাঁকে বৃহৎ শাফাআত দান করেছেন।

১৪। কিয়ামতের দিন তাঁরই উম্মত সংখ্যা সবার চাইতে বেশী হবে।

১৫। তিনিই কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার ও নেতা হবেন।

১৬। তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন।

১৭। তিনিই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

১৮। তাঁর মু’জেযা কুরআন মাজীদ কিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু অন্যান্য নবীদের মু’জেযা তাঁদের জীবনকাল অবধি সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯। এক মাসের পথ অবধি দূর থেকে লোকেরা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত হত।

২০। তাঁর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছিল।

২১। তিনি সারা জাহানের জিন ও ইনসানের জন্য সর্বশেষ নবী।

২২। তিনি অন্যান্য মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ জ্বরগ্রস্ত হতেন।

২৩। তাঁকে ৩০ জন পুরুষের সমান যৌন-ক্ষমতা দান করা হয়েছিল।

২৪। তাঁকে সারগর্ভ এমন কথা বলার শক্তি প্রদান করা হয়েছিল, যার শব্দ কম; কিন্তু অর্থ বেশী।

২৫। তাঁর প্রতি একবার দরূদ ও সালাম পড়লে দশবার আল্লাহর রহমতের অধিকারী হওয়া যায়।

মহানবী ﷺ-এর চরিত্র

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি সকল সচ্চরিত্রতাকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" *(আহমাদ)*

মা আয়েশা (রাঃ) তাঁর চরিত্র প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিতা হলে উত্তরে বললেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।'

তাঁর প্রভু তাঁর উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই তুমি মহত্তম চরিত্রের অধিকারী। *(সূরা ক্বালাম ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١٢٨ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট অবশ্যই এক রসূল এসেছে; তোমাদের কষ্টভোগ তার পক্ষে দুঃসহ। সে তোমাদের হিতাকাঙ্খী, মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। *(সূরা তাওবাহ ১২৮ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশী দানশীল, সবার চেয়ে বেশী সত্যবাদী, সবার চেয়ে বেশী কোমল-হৃদয়, সবার চেয়ে বেশী মহানুভব, সবার চেয়ে বড় বীর, সবার চেয়ে বেশী পূত-চরিত্র, সবার চেয়ে বেশী বিনয়ী।

তাঁর আচরণে অহংকার ছিল না। তিনি তাঁর সম্মানার্থে কারো দন্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করতেন না। দাসদের দাওয়াত কবুল

করতেন। নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। নিজের কাপড় নিজেই পরিষ্কার করতেন। নিজ হাতে ছাগী দোহন করতেন। নিজের খিদমত নিজে করতেন। মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং পাগড়ী বাঁধতেন।

তিনি পর্দানশীন তরুণীদের চাইতেও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন। সাদকাহ (যাকাত) গ্রহণ করতেন না এবং তা খেতেনও না।

নিজের কোন স্বার্থে কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হতেন না; অবশ্য আল্লাহর বিধান লংঘন বা কোন হারাম কাজ হতে দেখলে তিনি নিজ প্রভুর জন্য রাগান্বিত হতেন।

তিনি কোন দিন কোন স্ত্রী অথবা খাদেমকে প্রহার করেন নি। অপরের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাঁর নিকট ঘর-পর, সবল-দুর্বল ও স্বাধীন-ক্রীতদাস সকলেই সমান ছিল।

সামনে যে খাবার আসত তিনি তাই খেতেন, যা আনা হত তা ফিরিয়ে দিতেন না। যা অরুচিকর হত তা বর্জন করতেন; কিন্তু তার ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। যে খাবার থাকত না, তার জন্য কষ্ট-চেষ্টা করতেন না। তিনি হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না।

তিনি গরীব-মিসকীনদের সাথে উঠা-বসা করতেন। অসুস্থ রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দিতে যেতেন। জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। ঘোড়া, উঁট, গাধা ও খচ্চরের পিঠে সওয়ার হতেন।

তিনি রহস্য-রসিকতা করতেন; কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে নয়। তিনি শিশুদের সাথেও মস্করা করতেন। তিনি মুচকি হাসতেন;

হা-হা করে অট্ট হাসি হাসতেন না।

তিনি গৃহস্থালী কাজে পরিবারের সহযোগিতা করতেন এবং বলতেন, "তোমাদের মধ্যে ভালো সেই, যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে ভাল।" *(তিরমিযী)*

আনাস বিন মালেক ﵁ বলেন, 'আমি দশ বছর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমত করেছি; কিন্তু যে কাজ করেছি সে কাজের জন্য তিনি কৈফিয়ত তলব করে বলেন নি যে, কেন করলে? আর যে কাজ করি নি সে কাজের জন্যও তিনি কৈফিয়ত তলব করে বলেন নি যে, কেন করলে না?'

মহানবী ﷺ-এর হজ্জ ও উমরাহ

মদীনায় হিজরত করার পর বিদায়ী হজ্জ ছাড়া আর অন্য কোন হজ্জ করার সুযোগ তিনি পান নি। অবশ্য হিজরতের পূর্বে দুই বা তারও বেশী হজ্জ করেছেন।

তিনি উমরাহ করেছেন মোট চারটি। তিনটি যুল-ক্বা'দাহ মাসে এবং একটি তাঁর হজ্জের সাথে। প্রথম উমরাহ হুদাইবিয়ার বছরে, যা পালন করতে মুশরিকরা বাধা প্রদান করেছিল। দ্বিতীয় উমরাহ ছিল পরবর্তী বছরে তারই কাযা। তৃতীয় ছিল জিইর্রানার উমরাহ এবং চতুর্থ ছিল তাঁর হজ্জের সাথে।

মহানবী ﷺ-এর ইবাদত

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি কিয়াম করতেই থাকলেন, পরিশেষে আমি মন্দ ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে মন্দ ইচ্ছাটি কি? তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে যাব! *(বুখারী, মুসলিম)*

হুযাইফা বিন ইয়ামান বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো বা তিনি ১০০ আয়াত পাঠ করে সিজদাহ করবেন। কিন্তু তিনি তা অতিক্রম করে গেলেন। ভাবলাম হয়তো বা তিনি সূরাটিকে ২ রাকআতে পড়বেন। কিন্তু তিনি তাও অতিক্রম করে গেলেন। ভাবলাম, তিনি হয়তো সূরাটি শেষ করে রুকূ করবেন। (কিন্তু না, তা না করে) সূরা নিসা শুরু করলেন। তাও পড়ে শেষ করলেন। তারপর সূরা আলে ইমরান ধরলেন এবং তাও পড়ে শেষ করলেন!

তিনি ধীরে-ধীরে আয়াত পাঠ করছিলেন। তসবীহর আয়াত পাঠ করলে তসবীহ পড়ছিলেন। প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে প্রার্থনা করছিলেন। আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর রুকূ করছিলেন। *(মুঃ, নাঃ)*

তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে এত দীর্ঘ কিয়াম করতেন যে, তার ফলে তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল যে, আপনার তো আগে-পিছের সকল ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? (তাও আপনি এত

কষ্ট করে ইবাদত করেন কেন?) তিনি বললেন, “আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২২০নং)*

মহানবী ﷺ-এর দৈনন্দিন জীবন

দুই জাহানের বাদশা মা আয়েশা (রাঃ)এর বাসায় যে বিছানায় শুয়ে ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার এবং তার ভরাট ছিল খেজুর গাছের ছোবড়ার! আর মা হাফসার বাসার বিছানা ছিল পশমের।

তিনি কোন কোন সময় পর পর দুই-তিন রাত রাতের খাবার খেতে পেতেন না। কোন দিন দুই বেলা গোশ্ত ও রুটি খাওয়া ভাগ্য জোটে নি তাঁর। অধিকাংশ সময় পেট ভরে খাবার জুটত না। অবশ্য কোন মেহমানের সঙ্গে খেলে (তার মন রক্ষা করে) তৃপ্ত হয়ে খেতেন। কখনো কখনো মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেত এবং তাঁর ঘরে চুলা জ্বলত না! (সে সময় কেবল খেজুর ও পানি খেয়ে কালাতিপাত করতেন।) ক্ষুধার তাড়না হাল্কা করার জন্য কখনো কখনো তিনি পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন।

ফাস্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদেরকে তাঁর উম্মত বানিয়েছেন। তাঁর কাছে আমাদের আকুল আবেদন, তিনি যেন তাঁরই সাথে আমাদের হাশর করেন। তাঁরই আদর্শ ও হেদায়াত অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়ার তওফীক দিন। তিনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী, শ্রেষ্ঠ মাওলা ও মদদগার।